জুয়ার আসরে কোনো আঙুলই মিথ্যা নয়

জুয়ার আসরে কোনো আঙুলই মিথ্যা নয়

জুয়েল মোস্তাফিজ

অনন্যা

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৮

জুয়ার আসরে কোনো আঙুলই মিথ্যা নয়
জুয়েল মোস্তাফিজ

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রচ্ছদ
আশরাফুল হাসানের
“ট্রিম্যান অ্যান্ড ওয়াল’ অবলম্বনে
মাসুদ কবির

গ্রন্থস্বত্ব
মেরাতুন নেসা

পৃষ্ঠাসজ্জা
রুহুল আমিন

মুদ্রণ
কাগজ প্রকাশন
১১৬ আরজত পাড়া, মহাখালী, ঢাকা-১২১৫

ISBN NO.: 984-8311-15-7
মূল্য : ৮০ টাকা
টঝ ৳ ৫

প্রবেশ পথের কবিতা

শান্তি। কুয়াশার আড্ডার টেবিলে মুদ্রা ঘোরানোর হাতটা বেশ মনে পড়ে। সিঁকি আধুলিগুলো কী বিস্ময়ে ঘুরতো! মনে পড়ে তোমার হাতের কথা। যে হাতে অদ্ভুতভাবে জন্মেছিল ঘুঘুমাঝির শেকড়। এভাবেই শান্তির অর্থ খুঁজি বাবুশ্বর কিংবা তোমার সময়ে, ভাবলেই ধ্বংস হই। মাঝে মাঝেই রক্তের ভেতর বৈশাখী যন্ত্রণা এসে যায়, সাপগুলো শুধু জেগে থাকে, সময়গুলো শুধু জেগে থাকে, কারো যেন কোনো আঁধার নেই, ঘুম নেই, ভোররাত নেই। গিরিবালা এক নাগাড়ে কতদূর হাঁটতে পারবে এটা ভাবতে ভাবতে একদিন দুপুরে নিজেরই পা ফুলে ঢোল। আমি তো দুপুর বেচে খাই, আর কাঁচা কাঁচা দুপুরগুলোতেই ওঠে বিপত্তি, একদিন দুপুরগুলো বিক্রি হলো না বলে আতিকানূরী বলেছিল 'কি ভাই আপনার দুপুরে যে শঙ্খ বেজে উঠলো?' তা শুনে তুমি বলেছিলে কাণ্ড! কাণ্ড! ভাবনাটা একেবার ফেলে দেবার নয় বাবুশ্বর। যেমন গিরিবালার একটিও দাঁত ফেলে দেওয়া যায় না। তুমি একবার চিৎকার করে অন্ধকার নষ্ট করে দেখো না? দেখবে প্রশংসা আর প্রার্থনা এক নয় ঠিক যেমন নিঃশ্বাস আর বিশ্বাস... 'সন্দেহ করো তোমরা সন্দেহ করো' ঠিক এটুকু শিখেছিলাম বলে, এনাম স্যার বলেছিল 'আঙ্গুর তুমি চুপতো, তা ডিউ তুমি কী বলবে বলো?' মেনে নেওয়া যায় আল্লার ভাগ্নে চামাগাঁর ঢিণ্ডারা খ্যাপাকে। মেনে নেওয়া যায় কুয়াশা আশ্রমের পিন্টু কাকাকে, মাতাল হয়ে গান করতে করতে কাকা বলেছিল 'ফ্রেশ মন না হলে গান হয় না বাবাধন।' পিন্টু কাকার

মুখের গান শোনার জন্য আমরা একবার ফ্রেশ মন খুঁজেছিলাম,
আর খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়েছিল, আমাদের আত্মার ভেতর
অদ্ভুত এক ঘুড়ি কেবলি ওড়ে আর ওড়ে...

শব্দটি হবে 'জামপুর'। না ভুল হয়েছে শব্দটি। শব্দটি হবে 'বিড়িবালা'। না ভুল হয়েছে শব্দটি; শব্দটি হবে, 'জলচূর্ণ' ভুল হলো আবার; ঠিক বুকে, বুকের মাঝখানে গুলি এসে লাগা কানসাটের কিশোর। ভুল হয়ে যাওয়া মৃত্যুগুলো এক একটি শব্দ হতে কত নদী পাথর হবে বাবুশ্বর? পা ফোলা এবার একটু কমেছে, গিরিগাঁয়ে কমেছে বান । নিশ্চয় গিরিবালা কোঁচাভরা জামের ভারে দাঁড়িয়েছে জলেশ্বরীর পাড়ে। পা ফোলা তাই কমে গেছে বাবুশ্বর। কোন পাড়ে যেন এক গানওয়ালা পারাপার না বুঝে বেজে ওঠে...'গিরিবালার জামের চারা কেমনতরো গো... জানলে বলতো আমায় জানলে বলতো...' গলাটি কি তোমার ঈশ্বর? তোমার গলায় জামগাছ বেড়ে ওঠে? এভাবেই কি দিন রাত্রী? এভাবেই কি তুমি রাতের গলা বেঁধে হাঁটতে থাকো ক্রমাগত পথিকের দিকে আর বলে ওঠো 'ভাই জীবনে ভালো থাকবেন?' শান্তির ওপর পড়ে মৃত্যুর গুড়া, জল এসে মৃত্যুর ওপর ব্যভিচার করে বসে। শব্দটি তবে কী হবে? বিদ্যুৎ না কি রক্ত? কে যেন

চিৎকার করে ওঠে, শব্দটি ভুল হয়েছে দরদ! আমি আবার শুদ্ধ শব্দটি খুঁজে বের করি... কানসাট থেকে একজন মা চিৎকার করে ওঠে, শব্দটি ভুল হয়েছে জুয়েল মোস্তাফিজ; শব্দটি হবে আমার সন্তান যার নাম কিছুক্ষণ আগে আমি ভুলে গেছি; তার বুকে চন্দ্রগ্রহণের মতো বুলেটের দাগ আছে, তবে কি শব্দটি মৃত্যু? কানসাটের সকল মৃত্যুরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, না মৃত্যু বলতে আসলে কোনো শব্দ নেই...

উৎসর্গ

শাশ্বত সত্যের ঘরে অন্ধকার জমা হতে থাকে...আর
সময়ের ঘরে আসে আহত এক ঘোড়া; প্রকৃত ভাঙনের
খোঁজে কতকাল আগে লোমশ সূর্য হয়েছে ঘর ছাড়া;
তাইতো কোনো কোনো দিন পৃথিবী পাড়ায় মৃত্যুর শব্দ
শোনা যায়...তবুও শ্যামল সাপের মতো পাঁজরে তাঁর
অসংখ্য নদীর কারুকাজ; কবি শামীম রেজা

সুচি

যেখানে ঘুমোতে হয় না ঠিক সেখানেই ঘুমানো গ্যালো। ১৩
মাটির ভেতর মাটিরা কি আরামে আছে! গাছের ভেতর একটা ১৪
সব গল্পই তো শেষ। রাতের গল্পটা, দিনের গল্পটা, এমন কি ১৫
পৃথিবীর বয়স বেড়েছে ঠিকই কিন্তু আমরাতো মানুষের নাম জানি না ১৬
কতবেল গাছের ডালে ফাঁসি দিয়েছিল সরাইখানার শ্রমিক। ১৭
তোমাদের মতো গোছালো মাছের ঘর আমার নেই, ১৮
পাখির ভালোবাসা দেখলাম আর কাঁদলাম। ১৯
যেখানে সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিলাম সে সিন্দুক ভেঙে গেছে। ২০
হাসবো না আমি? আমার বাম পাঁজর ভেঙে গেছে, ২১
আমার জন্মকে পৃথিবীতে আনবো বলে নৌকা বানালাম। ২২
সন্ধ্যা লেগেছে আর কোনো কথা নয়, এবার ডুব দেওয়া যাক ২৩
অনেকদূর চলে এসেছি। এতদূর যে, সহসায় পৌঁছে যাওয়া যায় না ২৪
ফাঁকা বলতে আসলে কোনো মৃত্যুর নাম আছে কি? ২৫
দু'হাতে তপ্ত মাড় এনেছ? এই নাও প্রাণের তুলসিতলা ২৬
কান্নার উটগুলো জীবন দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায়। ২৭
শৈশবের তাড়া খেয়ে একদিন ঠিকই পৌঁছে গিয়েছিলাম কৃষ্ণচূড়ার ভূমিতে ২৮
মুকুটের পক্ষে যেদিন স্বাক্ষর করেছিল সিরাজ ২৯
দৃশ্যগুলো নিভে যাবে শীঘ্রই। ভেতরের নির্দেশক তাইতো বলে। ৩০
এতদিন পরে এলে তুমি চলে যাবার জন্য? সারা রাত জেগে ৩১
কোন সীমান্ত কোন দিকে গেছে বিশ্বাস করুন আমি জানি না। ৩২
কেমন আছে ভাঙনের ঘরবাড়ি? বিধ্বস্ত কৈতর ওড়ে পরাণের ৩৩
মৃত্যুর গল্পটা আর কেউ শোনে না। সবাই জেনে গেছে মৃত্যুই পরম আত্মীয় ৩৪
এই চোখ দেখেই কি তোমরা হেসে ওঠো? ৩৫
কথা বলবে বলে কথা দিয়েছিল যে বটগাছ ৩৬
চামচিকা, বসে বসে অন্ধকার খাও? আমারে বুঝি দেখনা তুমি? ৩৭
জুয়ার আসরে কোনো আঙুলই মিথ্যা নয়। ৩৮
তিন তাসের এক তাসে দেখেছি তোমার মুখ। ৩৯
লাশকাটা ঘরে কেন যে মেলে না দেহের কলকব্জা, ৪০
বালকবেলায় লাটিম খেলায় একবার হেরে গিয়েছিল আমার লাটিম ৪১
দাবার ঘরগুলো বড়ই অচেনা লাগে, ৪২
সকল ঘটনায় দুর্ঘটনা। এ কথা লেখা ছিল দুর্ভিক্ষের দিকে যাওয়া ৪৩
মাগো, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এই কার্তিকের সন্ধ্যা। ৪৪
এবারের শীতে আমি বাঘের কাছে যাবো। বাঘের হাতে পায়ে ধরে ৪৫
আমার জন্মপক্ষ থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেন যেখানে থেমেছে, ৪৬
শত্রুর কাছেও আমি মধু বিক্রি করি। শত্রু পক্ষের গোলাঘরে ৪৭
চোখ বন্ধ করলেই কত সব শুয়োর দেহের ভেতর ঢুকে পড়ে। ৪৮
ডাস্টবিনের গায়ে কোনো শীত লাগে না তাই ডাস্টবিন বড় বেশি ৪৯
আগুন লেগেছে পুবে আর তুমি জোয়ান ইলাহার সাথে চলে যাও ৫০
খরগোশের ইতিহাস লেখার আগে আমরা আরো একবার সূর্যের ৫১
আঠারো বছর কোনো প্রেমিক কিংবা যুদ্ধের বয়স নয়, ৫২
ভাঙা শ্লেটের ওপর ভেঙে পড়েছে শৈশব। ৫৩
এখানে এক হাজার মায়ের মৃত্যু ঘটেছে। ৫৪
বাবুলালের কপালে কোনো ডাকটিকিট নেই ৫৫
এক দুঃসময় আরেক দুঃসময়ের সাথে গলাগলি করছে দেখে, ৫৬
আমি পানশালার জুয়াড়ি বটে, তাই বলে কি তোমাকেও বাজিধরা যায় ৫৭

শাসকের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক নির্ণয়ে এবার আমরা হাডুডুর ৫৮
আমরা হাঁটছি অথচ আমাদের পাগুলো বেঁকে যাচ্ছে হলুদের দিকে ৫৯
কালান্তরে ফুল ফুটেছে, কিন্তু সে গন্ধ কি আর আমরা পাবো? ৬০
সমস্ত আলো দাঁড়িয়ে গ্যালো তুলা গাছের বিরুদ্ধে ৬২
যাবার সময় হলো, অথচ সময়ের যাওয়া হলো না। ৬৩

জুয়ার আসরে কোনো আঙুলই মিথ্যা নয়

এক

যেখানে ঘুমোতে হয় না ঠিক সেখানেই ঘুমানো গ্যালো। একটি কাগজের বাক্স, বাক্সের চার কোণায় চারটা নল, প্রত্যেক নলে গাঢ় অক্সিজেন ঢাললেই ঘুম আসে, খেটে খাওয়া ঘুমের বাড়ি গাড়ি নাই, ঘুমকেও অতি যতনে বাঁচতে হয়। আমাদের মতো জাগরী ঘুমের মানুষেরা সেই ঘুম পুষে রাখতে পারে না। দুঃখী মানুষেরা যেখানে ঘুমায়, সেখানেই চাঁদমারীর বিছানা।

গল্পটা ফাঁদা যাক এবার, দরগাতলার আগুনে মানুষ পোড়ানো ভোর, প্রতিদিনের ভোর যথাসাধ্য বেলুন, বেলুনের উল্টো সোজা নেই, শুধুমাত্র ফুলে থাকা বেলুন। সুখী মানুষের অন্ধকারে দুঃখী মানুষের কোনো ঘুম আসবে না, আমরা তেলচিটে মানুষ পেটের খাবার জোটাতে গিয়ে রক্ত কালো হতে চলেছে, ঘুমের খরচ কোথায় জোটে; আর তাইতো আমরা ঘুমাতে যাই না চোখ বন্ধ করি, যারা সারারাত ঘুমাবে না বলে কৈবর্ত পাড়ায় যৌনচক্রে পড়েছে, কেবল তাদের তালগাছের মতো ঘুম, আমরা বাকিতে কিনি।

গল্পটার শেষ অংশ কিন্তু এই রকম, ঘুমের ঘোড়া মারা যাবার পরই ঘুমের পাখি। নইলে কি স্বপ্ন দেখে এখান সেখান যাওয়া আসা? ঘুমের কল্যাণে তোমার বাড়িও যাওয়া যায়; কিন্তু ঘুমের ঘোড়ার আত্মার কথা ভেবে ঘুমের পাখি উড়ে যায় কুয়াশা গাছের ডালে, চাঁদ মাঠের জালে, এই জন্য ঘুমের গুরুত্ব পানসে। যাব না যাব না করে কতকাল গ্যালো, এটা কি কোনো গল্পের শেষ? আছে হয়তো রহস্য কিছু... ঘুমের ব্লেড ঘেমে উঠেছে এখন।

১৫ কার্তিক, ১৪১৪
৩০ অক্টোবর, ২০০৭

দুই

মাটির ভেতর মাটিরা কি আরামে আছে! গাছের ভেতর একটা অদ্ভুত ফোঁকর থাকলেও আমরা দুঃখেই থাকি। আমাদের মাথার ভেতর হঠাৎ উদ্ভাবিত মৃত্যু। আমরা দৌড়াতে পারি না, কারণ আমাদের পা টুপি পরে থাকে। যাত্রার কিংবা সাকার্সের স্টেজের কাছে আমাদের মানায় ভালো, কিন্তু যাত্রা কিংবা স্টেজের বাঁশ খুঁটি আমাদের মানিয়ে নিতে পারে না। আমরা বড় বেশি হজম করতে যাই না, ফলে কবুতরের ভালোবাসা আমাদের পাঁজরে বাজিয়েছে অসময়ের ঘণ্টা। এই যে ধরুন, এত বছর ধরে সময় ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি না, এই ভেবে যে বসে আছি তা কিন্তু নয়, আমরা শাদা ঘড়ি, কালো ঘড়ি, কিংবা ইতিহাসের বিভিন্ন লাল ঘড়ির কাছে গিয়েছি, ভাঙা ঘড়ির পদতলে পুজো দিয়েছি তথাপি সময় ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। আমাদের সাথে প্রায়শঃ কথা বলতো সময়ঘাতী লোকজন। তখন দেখতাম সময়ের সাথে ধুতুরা গাছের কথা হতো, আমরা জ্যামিতি বক্সের কাঠি দিয়ে ফোড়া ফাটিয়ে ছিলাম বলে জীবনের সকল দাগই বাঁকা; আচ্ছা বলুনতো দাগ বাঁকা হলে কি বাঁচা যায়? বাঁচার জন্য অন্তত সময়ের সোজা সোজা দাগ লাগে...

১৫ কার্তিক, ১৪১৪
৩০ অক্টোবর, ২০০৭

তিন

সব গল্পই তো শেষ। রাতের গল্পটা, দিনের গল্পটা, এমন কি শেষ গল্পটাও। ভুল গল্পটা শেষ হবে না জানতাম কিন্তু সে গল্পটাও শেষ। শেষ গল্পটা বেশ মজা করে বলছিল পানু কাকা, সে গল্পও শেষ। মৃত্যুর গল্প ধরেছিল সরেন ডোম, মরার বাড় বেড়েছে উত্তর পক্ষে গল্প নয় সত্যি, সত্যিটুকুও শেষ হয়েছে গতরাতে। দেখুন, সব শেষ বলে আপনার পাগলা চুলগুলো আর বাড়তে দেবেন না প্লিজ! বারো মণ গালি কিনতে গিয়েছিল ওই কার্তিকের পাগল, সেই গালির কিছু অংশ শেষ হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। গতরাতে পাগলনামা পড়তে পড়তে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল, ঘুরবে না বলুন? এত ঘোড়া কীভাবে সামলানো যায়, ইতিহাস থেকে ঘোড়াগুলো পালিয়ে যাচ্ছে পালাতে পালাতে নিভে যাচ্ছে। বলে রাখলাম; আগামী বর্ষা থেকে ইতিহাসে আর কোনো ঘোড়া পাওয়া যাবে না। সব ঘোড়া পালিয়েছে ইতিহাসের পাতা থেকে, যুগের রক্ত থেকে। কি আশ্চর্য! শেষ হয়ে আসছে পুরনো রক্ত, নতুন রক্ত। আমি যদি ডাহুক কিংবা পরিত্যক্ত নারীর কথা বলি তবে আপনাদের মন কাঁদবে নিশ্চয়ই? তবে কাঁদুন একবার, ভিজে যান দ্রুতগামী নোঙর কিংবা ইঁদুরের মতো। শেষ হয়ে আসছে সকল গল্প, খালের গল্প, কালের গল্প। না না কালের ভেতর কোনো সাপ ঢুকেনি, দিব্যচোখের সরল দৃষ্টি আছে কালের পথে, দিব্যলোকের দৃষ্টি দেখতে অনেকখানি সাপের মতো, চেতনা বলতে যে ঝুমঝুমি বাজে আসলে তা কিছু নয় মেয়েটি পাগল হয়ে গিয়েছিল মাত্র; তার কান্নার গল্পটাও শেষ, তার কান্না থেকে তার কবর পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি কবে নাগাদ শেষ হবে এই ভেবে বসে আছি, বসে আছি আহত চাঁদ...

১৬ কার্তিক, ১৪১৪
৩১ অক্টোবর, ২০০৭

চার

পৃথিবীর বয়স বেড়েছে ঠিকই কিন্তু আমরাতো মানুষের নাম জানি না। বাঁশিওয়ালার কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু লাল মোরগওয়ালা? সময় অসময়ের ধার ধারে না। আরো একটা ব্যাপার, মানুষের নাম নিয়ে গরুকাটার সময় গরুর নামও আমরা জানি না। পতাকার বাঁশ কাটতে গিয়েছিলাম এমনকি যেদিন আমাদের রোজি দিদি মারা গেল সে মৃত্যুর বাঁশও কেটেছি, কিন্তু রোজি দিদির নাম তো জানি না। এই যে এত কিছু জানি না এই জন্য আমাদের অতিরিক্ত ফুলপ্রীতিও লাগে না, আমাদের অতিরিক্ত মৃত্যুপ্রীতিও নেই।

জান, আগুন নিয়ে কথা হলে আমার খুব ভালো লাগে। হঠাৎ করেই তোমার অমন মুখের বয়স বেড়ে গেল। সহস্র বছরের মুখ আর আগুন; সেদিন খুব আগুন নেমেছিল, হাড়িতে হামাগুড়িতে একটি বেড়ালও অবশিষ্ট ছিল না। কারো বাঁচার কথা শুনলে শাদা বেড়ালগুলো পুড়ে যায়, কারো মরার কথা গুনলে কালো বেড়ালগুলো পুড়ে যায়। বর্ণিল বেড়ালের সাথে কীভাবে কীভাবে যেন সূর্যের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা সূর্যের নাম কী? তোমার নামটার মতো কিছুতেই মনে আসছে না। সব নাম ভুলে গেলে প্রান্তর আর প্রান্তিকের কথা মনে আসে, কিন্তু খোলা প্রান্তরে দৌড় দিলে সেটুকুও আবার ভুলে যাই। ওই যে কী যেন নাম, যে নামে মসজিদ, মন্দির, বাঁকা জগতের বাঁকে পা ভাঙা নেমেসিস। বহুদিন পর জানা গেল সকল ঈশ্বরই আমাদের আত্মীয়। ঈশ্বরের নাম কিন্তু আমি জানি, আর জানি বলে প্রতিটি তীর আমার দিকে ছুটে আসে, তীরগুলোর নাম তো আমি জানি না, এত কিছুর পর পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে তোমার বয়সের একটা মিল পাওয়া গেল; বেশিদিন কাছে থাকো না...

১৬ কার্তিক, ১৪১৪
৩১ অক্টোবর, ২০০৭

পাঁচ

কতবেল গাছের ডালে ফাঁসি দিয়েছিল সরাইখানার শ্রমিক। ওই শ্রমিকের প্রাণে বাঁধা ছিল একটা নীল পাথর, তার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট পাথর নিয়েই এবারের কাব্য। কাব্য ঠিক নয়; ওই পাথরের অর্ধ অংশ অন্ধকার হয়েছিল তারই গল্প হয়তো। আমাদের জীবন থেকে পশ্চিম দিকে যে পথ চলে গেছে, একটু লক্ষ্য করলেই পাওয়া যাবে কতগুলো দ্রুতগামী শিশু আর তাদের কান্না, সেই কান্না শুনতে শুনতে আমরা কালান্তর পাড়ি দিই। সরাইখানার শ্রমিকের কবর আছে জীবনের পশ্চিম পথে। মৃত্যুর জন্য কতবেল গাছই আদর্শ গাছ; সরাই শ্রমিকের এপিটাফে লেখা ছিল বলে আমরা পড়তে পেরেছিলাম। কতবেল গাছ স্বপ্নের ভেতর বড় হয়, ঘুমের ভেতর বড় হয়, বেশ্যার শাড়িতে বড় হয়। কতবেল গাছের ডালে মৃত্যুর আহ্বান আছে। একটু ভেবে নিলে ভালোভাবে বোঝা যাবে সরাইখানার মাঠে অনেক কতবেল গড়াগড়ি করে।

বাদ দিই এসব কথা; কতবেল গাছের রাগ হলে বাঁচান থাকবে না। সেদিন পোস্ট অফিসে দেখে এলাম প্রতিটি চিঠিই সরাইখানার, বেশ্যাবাড়ির আর কতবেল গাছের। ভয়ে দৌড়ে এসে দেখি সকল মানুষই কতবেল গাছের নিচে, বেশ্যাবাড়ির ছায়ায়, সরাইখানার ভেতর। মানুষেরা মৃত্যুগামী কখনোই ছিলো না, মৃত্যুরা মানুষগামী বলেই বেলগাছের পাতা সবুজ।

১৬ কার্তিক, ১৪১৪
৩১ অক্টোবর, ২০০৭

ছয়

তোমাদের মতো গোছালো মাছের ঘর আমার নেই, পৃথিবীর প্রথম গান যেদিকে বেঁকে গেছে সেই দিকে আমার ভাঙা খাট আর ভাঙা বিছানা। তাইতো পথে পথে মাছওয়ালাদের দেখলেই আমি গোছালো শব্দের অর্থ বুঝি। অন্তত, যে মাছগুলো গান করে সে মাছের সময় বুঝি। বুঝতে বুঝতে মাছওয়ালা বেঁকে যায় ঘন গ্রামের দিকে, আমি বেঁকে যাই বাদুড়খানার দিকে। সাঁঝের বেলা বাদুড়ের ছেলেমেয়েরা মাদুর পেতে বসে, আমি কলাগাছের দিকে চেয়ে থাকি। কলাগাছের দুঃখটা শুনেছিলাম আইনাল হকের কাছে... যাক এসব; অনন্তের পথে তোমার কালো ব্লাউজই উজ্জ্বল... আমি গরিব মানুষ আমার ঘর বারো পথের বারো মাথায়।

১৬ কার্তিক, ১৪১৪
৩১ অক্টোবর, ২০০৭

সাত

পাখির ভালোবাসা দেখলাম আর কাঁদলাম। পাখিরা ভালোবাসবে এটা তো পূর্ব শর্ত ছিল? তবুও কাঁদলাম। আমি গরিব মানুষ দৌড় দিতে পারি না, তাইতো সাপ আমার আগে যায়, চুনারীপাড়া আমার আগে যায়, আগে চলে যায় মাটিবন্দি ঘুম। আরো পাখি পাখি করলে আরো কান্না আসে, পাখির আরো ভালোবাসা হয়। আমি কি পথের ভেতর করুণ বাঁশি, নইলে যে একটাই ঘুমে, ঘুম গ্যালো আগে আমি থাকলাম পিছে, বলুন দেখি এভাবে ঘুম হয়? এভাবে কি রাতের সন্ন্যাস বাঁচতে পারে? এই জন্য সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায় তা হলো একপক্ষ মৃত্যু অন্যপক্ষে পাখির ভালোবাসা। একদিন সমস্ত অন্ধকার দাঁড়িয়ে গ্যালো রাতের বিরুদ্ধে। ধার করেছি নিঃশ্বাস তা দিয়ে বেঁচেও আছি, কিন্তু ছোট ছোট হাতগুলো মৃত্যুর প্রসঙ্গ আনলো, মরতে পারাটা সত্যের মতো কিছু নয়, মিথ্যার মতো কিছু নয়। স্বপনে বপনে আমরা অনেক দেখি, হরেক রকম মৃত্যু আছে রাতের গভীরে। ছোট ছোট মৃত্যু দিয়েও বেঁচে থাকা যায়...
কোনটা বেশি জরুরি? বাঁচতে পারা নাকি পাখির ভালোবাসা। জরুরি আইন খুঁজে পাওয়া গ্যালো না। তাইতো অন্তিম অন্ধকারের কাছে রেখেছি জমা কোনটা জরুরি। জানি, তুমিই এই প্রশ্নের উত্তর জানো কিন্তু তোমাকে তো এই প্রশ্ন করিনি? যাই হোক, যা হোক, স্বপ্নগুলো আগে চলুক, আমি পরে যাবো...

১৬ কার্তিক, ১৪১৪
৩১ অক্টোবর, ২০০৭

আট

যেখানে সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিলাম সে সিন্দুক ভেঙে গেছে। দুধ দিয়ে পোষা নদী সব ভেঙে ঢুকে পড়েছে সিন্দুকে। জল বানান করতে পারিনি শৈশবে, তাই লাল জীবন নীল হলো। ঘাড়ের ওপর বেল পাকা ফোড়া উঠেছে, ওই ফোড়ার নাম দিয়েছি নীল, এখন আর খুব বেশি লুকিয়ে থাকা, লুকিয়ে রাখা নেই, তাইতো জ্যোৎস্না বুঝেই সব সাপ বেরিয়ে এসেছে বনে। ভাই সাপওয়ালা; ভোট দেবেন কাকে? সকল ঘাটে জল সকল ঝোপে সাপ। যাই হোক, এত কিছু ভাববার সময় কি আমার আছে? আমার সিন্দুকে ঢুকেছে নদী। তাইতো ভেজা ভেজা লাগে সূর্য, ভেজা ভেজা লাগে চাঁদ। পেছন পথে হাঁটতে থাকা লোকটাও ভেজা ভেজা। এত ভেজা ভেজা কোন আলোতে শুকাবে? সারারাত খুঁজে কোথাও কোনো সূর্যের দেখা মেলেনি। দেখেছি ভেজা গায়ে নদী ফেরত শাড়ি, খুব করে তোমাকে খুঁজলাম, কই নাহ! প্রাচীন দড়ির ভেতর জীবনের সমস্ত নিঃশ্বাস আটকা পড়েছে।

১৬ কার্তিক, ১৪১৪
৩১ অক্টোবর, ২০০৭

নয়

হাসবো না আমি? আমার বাম পাঁজর ভেঙে গেছে গুনটানা প্রেমিকের পায়ে বেধে, প্রেমিকের পা দিয়ে বেকুব মাঝি এদিক ওদিক যায়... ভাঙলো তো রাতের পাটাতন? একটা সেপ্টিপিন আটকা পড়ে আছে মাংসের ভেতর, তোমরা তো সবাই জানো কতদিন লাল ময়ূরের স্বপ্ন আমি দেখি না, তবুও ভেঙে গ্যালো কাচ, এত মৃত্যু এত ভাঙা আর আমি হাসব না? হেসে তো আর পার পাওয়া যাবে না তাইতো পথে নেমে খুঁজতে বেরুনো গ্যালো প্রেমিক। প্রেমিকের তো পাঁচ পা থাকে, প্রেমিকের তো পাঁচটা মৃত্যু এক পাত্রেই থাকে। পাত্রগুলো এখন উল্টে আছে পৃথিবীর পথে। আর কোনো প্রেমিক বেঁচে নেই মাটি কিংবা কাচের মতো। সেদিন দৌড়ে গেলাম পেছনে, দেখলাম ঘুঘু আর সর্বনাশ। মনটা খারাপ হলো; তারপর দৌড়ে গেলাম সামনে, দেখলাম সহস্র চোখ মারবেলের মতো পড়ে আছে পথেঘাটে। মনটা খারাপ হলো। এত খারাপ দিয়ে তো আর খুশি হবে না তুমি। তাই বর্ষার এক কোণে বসে থাকি। জানি চুল শুকানোর কোনো বাতিক নেই তোমার, বর্ষায় কোনো রোদও ওঠে না। ভুলেশ্বর তুমিই বলো, আমিতো সর্বনাশের আমি হাসবো না? খুব করে হাসবো, হেসে হেসে শ্মশানে যাবো, হেসে হেসে মাথা ফাটাবো, হেসে হেসে দেখে নেবো বেড়ালের মিছিল। হাসি ব্যাপারটা কেন জানি তোমাদের ভালো লাগে, তাইতো আমি হাসি, ভাঙনের চূড়ান্ত দিনেও আমি হাসি...

১৭ কার্তিক, ১৪১৪
১ নভেম্বর, ২০০৭

দশ

আমার জল্মকে পৃথিবীতে আনবো বলে নৌকা বানালাম। নৌকার পায়ে নূপুর পরার দিনক্ষণ মনে আছে আমার। বিলম্বিত বাইচের নেশায় ভেঙে গেল নৌকা। জল্মকে আর পৃথিবীতে আনা হলো না। জামপাতা কিংবা বরফের কুচি দিয়ে তুমি তাকাও, বরফের ভেতর গাঢ় রক্ত দিয়ে তুমিও নিঃশ্বাস নাও। ভালো; খুবই ভালো। কিন্তু অনাগত জল্মের কান্না দিয়ে আমার ঘুম আসে আমার বেঁচে থাকা হয়। ফাঁদ পেতেছে বাতাসি ইলাহা, বাতাসি ইলাহার ভেতর জল্ম আটকা পড়েছে। ইস্! তোমাদের গ্রামে আতুর ঘরের এত গন্ধ, তোমাদের গ্রামের অদূরে ইলাহার তাঁবু, অথচ আমার জল্ম! জল্মকে জন্ম ভেবে অনেকেই ভুল করে বসে আছে। আরে আমিতো খুব আস্তে কথা বলি না, জন্মতো সন্ধ্যার আত্মীয়, জন্মতো হঠাৎ করে শাড়ির ভেতর ঢুকে পড়া সর্বনাশ। তবুও তোমরা কেন যে জল্মকে জন্ম ভেবে ভুল করো? বুঝতে পারি না, এই যে ক'দিন ধরেই; বোঝার চেষ্টা করছি মানুষেরা কাদের দখলে যাবে? অন্ধকারে মানুষের দিকে ছুটে আসছে অদ্ভুত বাতাস। প্রতিদিনের নিঃশ্বাস দিয়ে কারা কারা যেন ভেতরে চলে যায়। ব্যাপারগুলো বোঝার চেষ্টা করছি। তবুও তোমরা ভুল করলে? ধরো নাচের তাবিজ পরে থাকা জল্মের পা, জল্মের সাথে জামগাছ, লিচুগাছ আর আনিফ রুবেদ। হলো তো, মরলো তো, ভাঙলো তো জল্ম আনার নৌকা? বন্ধুরা তোমরা কেন যে আমাদের বোঝ না? তোমাদের ইলাহার গোপন অন্দরে আটকা পড়েছে আমার জল্ম, প্রতিদিন ভোররাতে কান পেতে আমি তার কান্না শুনি।

১৭ কার্তিক, ১৪১৪
১ নভেম্বর, ২০০৭

এগার

সন্ধ্যা লেগেছে আর কোনো কথা নয়, এবার ডুব দেওয়া যাক। তরল মাটির ভেতর প্রান্তিক ডুব। তরল মাটিকে আবার নদী ভেবে কথা বাড়াবেন না। কথা শেষ। এবার হালকা বাঁশি বাজুক, অন্তত যতক্ষণ দম আছে। দম দিয়ে তোমাদের ব্যবসাটা ভালোই চলছে বুঝি? দমের ভেতর পাখিরা বাসা বাঁধলেও তোমরা মুদ্রার ওজন করো। আমরাতো বলিনি যে আমাদের লোভ নেই; তোমরা দিব্যি দেখে আসতে পারো আমাদের কসাইখানা। পৃথিবীর সর্বশেষ শিশু আর গোলাপের মুণ্ডু কাটা আছে সেখানে। দম নিয়ে আমরাও যে দু'একবার ঘুড়ির আয়োজন করিনি তা কিন্তু নয়। কিন্তু তোমরা? সব কিছুর বিনিময়ে মুদ্রা মুদ্রা করো।

জানো আমার কাছে একটা ছবি ছিল। বেশি পুরনো নয়, এই ধরো পৃথিবীর জন্মের আযান পড়েছে, আলো ডেকেছে কালো কালো বেড়াল, ঠিক সে সময়ের। আচ্ছা সন্দেহ বেড়ে গ্যালো যে? আগে জন্ম কার? পৃথিবীর না বেড়ালের। যাই হোক, জন্ম যারই আগে হোক ওই ছবিখানা ছিল চলিষ্ণু, নাচের চৌহদ্দি থেকে প্রাণের বৈঠকি সব পথই ছিল তার চেনা। একদিন দুধেভাতে উৎপাত, মাংসের আয়োজন, নাচের আয়োজন, আর আয়োজন ছিল অন্তিম স্নানের। ছবিখানা ভিজে গ্যালো, ছিঁড়ে গ্যালো, কুচি কুচি কাগজের মতো কুচি কুচি বাতাসে উড়ে গ্যালো পৃথিবীর জন্মের একটু আগে। এই রকম গল্প বললে তোমাদের ব্যবসা আর আমাদের লোভের ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কাঁচা কাঁচা কথাগুলো গল্প হবার কষ্ট দমের ব্যবসায় নেই, তবুও দমের ভেতর চলছে প্রস্তুতি, কবে যে পৃথিবী, বেড়াল আর ওই ভেজা ছবিটার পুনর্জন্ম হবে?

১৭ কার্তিক, ১৪১৪
১ নভেম্বর, ২০০৭

বার

অনেকদূর চলে এসেছি। এতদূর যে, সহসায় পৌঁছে যাওয়া যায় না পরিত্যক্ত কোনো শাড়ির বন্দরে। এ পাড়া বড়ই অচেনা, এখানকার আলো বাতাসগুলো নিঃশ্বাসের জন্য বড়ই কষ্টদায়ক, বড়ই গোল গোল পাথর। নিঃশ্বাস নিয়ে সমঝোতা হয়তো হয়েছে, কারণ শ্রেফ বাঁচার ক্ষেত্রে আমরা আদি অন্তের পাইকারি শ্রমিক কিন্তু দূরের মানুষেরা আমাদের ঠিকানা বলতে পারে না। দূর সমুদ্র নয়, আরো দূর যেখান দিয়ে পোড়া মানুষ ভেসে যায়। না না, তীর আর পচা মানুষের গল্প নয়, উপড়ে ফেলা চোখ, তুলে ফেলা মাথা। আপনারা হয়তো এই দূরের কথা বুঝতে পারছেন না; কি বলে যে বোঝাই...

ধরুন আগুন দিয়ে আমাদের কোনো বন্ধু সকল রাত পুড়িয়ে ফেললো; আর আমরা দৌড়ে দৌড়ে চলে গেলাম দূর মহালের দিকে, ঠিক সর্বপ্রথম যেখানে রাতের জন্ম হয়েছিল। আমরা হয়তো কেউ কেউ সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠতে পারি। রাতের জন্মপাড়া অন্য কোনো দূরে... ঢেউটিনের অন্ধকারগুলো আপনারা চিনবেন হয়তো কিন্তু সে অন্ধকারের ঠিকানা? ওই আগুনের ভয়ে পলাতক অন্ধকারগুলো যেখানে তাঁবু ফেলেছে ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে আছি গরিব মানুষের মতো। চেনা যায় এই পাড়াটা? কেউ কি ফেরাতে পারবেন অন্ধকার আর আমাকে? কী করে এই দূর ভেদ করে সকল পথগুলো তোমাদের দিকে যাবে? পথের পা ভেঙে আছে, ঠিকানাও নাই। দূরের কাছে চলে এসেছি তাই আজ রাতে এক পাঁচালি বসবে; দূরের রাজা বলেছে, আরো কিছু দূরে আরো কিছু ঢেউটিনের অন্ধকার আছে; সেখানকার ঠিকানা আরো কিছু দূর। আমি প্রতিদিন ওই ঠিকানা মুখস্ত করি।

১৮ কার্তিক, ১৪১৪
২ নভেম্বর, ২০০৭

তের

ফাঁকা বলতে আসলে কোনো মৃত্যুর নাম আছে কি? রাজহাঁস উড়ে গেলে শূন্যের বয়স বাড়ে। ফাঁকা জায়গাটা ফাঁকা নয়, সেখানে বাড়ে দীর্ঘশ্বাসের চারা। আমরা সহসায় যতটা দুঃখী হয়ে উঠি ফাঁকা জায়গাগুলো কিন্তু অতটা দুঃখী হয়ে ওঠে না। তবুও কেন যে মানুষেরা ফাঁকাবন্দি আছে? ধড়কাটা রাজহাঁস দেখলেই শূন্যের ঘরে আরো একটা ফাঁকা রাজহাঁস দেখা যায়। তোমাদের নিশ্চয় মনে পড়বে কবর পাড়ায় বেড়াল কাঁদার দিন। বেড়ালের কান্নাটা কেন যে শিশুর কান্নার মতো? মানুষ ফাঁকার মর্ম বোঝে না, ছুটে যায় কবর পাড়ায়। অদ্ভুত ব্যাপার সব মানুষের মুখ আঁকা যায় না, কেবল যে মুখের ভেতর ফাঁকা আছে, যে মুখের অন্দরে সুবর্ণলোম বেড়ে ওঠে তার মুখই আঁকা যায়, রাখা যায়। এই এক অন্ধ শিল্পীর দৌরাত্ম্য, যে শিল্পীর পুরোটাই ফাঁকা...

সেদিনের গল্পটা কিন্তু এবার আমি বলবো। সব সাঁকো মাথায় করে কিসের যেন অভিমানে লোকটা চলে গ্যালো। কেউ কেউ পাগল পাগল করে ওঠে। মাচা ভাঙলো, খাঁচা ভাঙলো, অথচ কোনো শব্দ হলো না। বেড়াল কাঁদলো শ্মশানে আর তোমরা শিশু ভেবে দৌড়ে গেলে জলের কোলে, কোলভরা আগুনে পুড়ে;— ফিরছিলে তোমরা। লোকটি কি মানুষ? মানুষ কি ঈশ্বর? ঈশ্বর কি সহজে পাগল হয় গো? তাইতো সব ফাঁকা জায়গা মাথায় করেছিল আহত বাতাস। কতই বা বয়স হবে বাতাসের, কেবা পানি দিবে বাতাসের প্রাণে, তবুও ধূসর ডালে বাসা বাঁধে পলাতক মানুষজন। কেউ চলে গেলে ফাঁকা প্রান্তর ধবধবে শাদা। মানুষেরা একথা বোঝে না, অযথায় ফাঁকা প্রান্তরে দৌড়ঝাঁপ করে। আর ভেতরে ভেতরে পরাহত মানুষের পায়ের ছাপ বেড়ে ওঠে। বাড়তে বাড়তে মন্দির হয়, গম্বুজ হয়, কিন্তু পায়ের ছাপগুলো পুনরায় মানুষ হয় না।

১৮ কার্তিক, ১৪১৪
২ নভেম্বর, ২০০৭

চৌদ্দ

দু'হাতে তপ্ত মাড় এনেছ? এই নাও প্রাণের তুলসিতলা, ঢালো? যত খুশি। অন্তত প্রাণতলা যতক্ষণ লাল না হয়ে ওঠে। আমার গায়ে তোমাদের এসব চাষবাস যে কী কাজে আসে? কতদিন আর বলবো, পুরোহিত আর পয়গম্বরের নেশা আমার ধরে না, আমার ঘুম আসে। তবুও কেন যে কালান্তর হতে মাড় এনে আমার গায়ে ঢালো। ব্যাঙ ডাকলেই নাকি চাঁদ ওঠে আর চাঁদ উঠলেই মরে যায় আঁধারের স্বপ্ন। এমন কথার কোনো গুরুত্ব আছে বলুন? তবুও আমাদের মনু খ্যাপা এ কথা পথে পথে বিক্রি করে। মানুষজন কেনেও দেখি, গুরুত্ব তাহলে কিছু আছে নিশ্চয়? আছে বলেই হয়তো অমাবস্যা আঁধারে গাছেদের গ্রাম মুখরিত হয়। রাতের যখন অনেক বয়স হয় তখন কান পাতলেই বেয়াড়া গাছের উলুধ্বনি কানে আসে। আর তোমরা আমার গায়ে তপ্ত মাড় ঢাললে? ঢালো যত খুশি ঢালো। অন্তত জীবনতলা যতক্ষণ শাদা না হয়ে ওঠে...

'সাপটোটেম' চিহ্ন পড়লো কপালে, আর কীভাবে যেন ওই চিহ্নটা চোখে পড়লো একটা লোকাল ট্রেনের। লোকাল হলে কি হবে ওই ট্রেনের শেষ মাথাটা তোমাদের পাড়ায় গিয়ে থামে। কৃষ্ণচূড়ার ভার নিয়েছিল দুঃখী কবুতর আর উড়তে গিয়ে সে ভারে মরেছিল সে। এমন কথা অনেক। তবু মনে পড়ে লোকাল ট্রেনের মায়া। ট্রেনতো আহত স্টেশনের বন্ধু। বন্ধু মরে গেলে কে না কাঁদবে বলো? দেখেছিলাম লোকাল ট্রেনের কান্না। মরা স্টেশন, মরা কাক আর মরা ডাকটিকিট। এসবের অন্তর দিয়ে আমি বসে আছি বিধবা পথে, ব্যথায়। তোমরা জান না বন্ধু, জীবনের পূর্বপাড়ায় সে কি উৎপাত, ভাঙনের হাঁক দিয়েছে বাম পাঁজরের সর্দার, সর্বনাশের ডাক দিয়েছে সূর্যের সন্ন্যাস, মৃত্যু মৃত্যু বলে চিৎকার করে রক্তের শিশুরা। আমার এমন দিনে তপ্ত মাড় এনেছ তুমি? তবে ঢালো যত খুশি; পুড়ে যাক প্রাণের লোকাল স্টেশন।

১৯ কার্তিক, ১৪১৪
৩ নভেম্বর, ২০০৭

পনের

কান্নার উটগুলো জীবন দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায়। ওই উটগুলো কত দূর যাবে জানি না, তবে আটকা পড়েছি সময়ের ফাঁদে। কেন যে সময় প্রশ্নের কোনো উত্তর পেরে উঠছি না আমি? তাইতো কান্নার উটগুলো দৌড়ায় জীবনের অলি গলি দিয়ে; কেন যে সহজ প্রশ্নের উত্তরগুলো মনে আসে না? এইতো কিছুক্ষণ আগে মনে ছিল 'বাবলার কাঁটায় ফুঁড়ে মরেছে সময়' কিন্তু এখন আর মনে আসে না। নিলামে উঠেছে জীবনের এদিক ওদিক, তাই বুঝি কান্নার উটগুলো পেয়েছে তাড়া। হাতে পাথর, পায়ে পাথর, মাথাটাও পাথর এমন এক ক্রেতার কাছে বিক্রি করা গ্যালো আমার স্বপ্নগুলো। স্বপ্নের শিশু স্বপ্নের যিশু সব। পৃথিবী ভাঙার আসামী আমি, তাইতো অনন্তের পথে ছেড়ে দিয়েছি অন্তর। আমার সামনে আমারই অন্তর চিৎকার করে করে চলে গ্যালো। চোখ দুটো দিয়েছি অন্ধ কুয়াশানদীকে। তোমার দিকে যাওয়ার পথই পেয়েছে আমার ভাঙা পা। হাত দুটো কীভাবে কীভাবে যেন বেহাত হয়ে গ্যালো আমার। সাক্ষী দিয়েছে বাবলার গাছ; তাইতো লোভ আর লীলাগুলো দিয়ে দিয়েছি বাবলা গাছের কাছে।

পরিচিতরা শোন; এখন থেকে আমি হাওয়া হয়ে গিয়েছি। যে হাওয়ায় তোমাদের দুঃখ ভেসে যায়। জীবনতো আমাকে নিল না, তোমরা তো আমাকে নিলে না, তাইতো পাথর অন্ধকারের দিন আমি আর আমি নেই, আমি হাওয়া হয়ে গিয়েছি।

১৯ কার্তিক, ১৪১৪
৩ নভেম্বর, ২০০৭

ষোল

শৈশবের তাড়া খেয়ে একদিন ঠিকই পৌঁছে গিয়েছিলাম কৃষ্ণচূড়ার ভূমিতে। নদীগুলো আর নদী থাকলো না হয়ে গ্যালো ধবধবে দুধ। সূর্য আর সূর্য থাকেনি পিঠের ওপর হয়েছে ফোড়া। সেদিন ছিল কার্তিকের কত যেন, সময়ের বেড়েছে বাড়, নড়ে উঠেছে মাথার হাড়, যাবিকাহা! পূর্ণিমার পূর্বক্ষণে আমার মৃত্যু। মৃত্যু হলে কি হবে? সূর্য থেকে পালিয়ে আসা বেড়ালগুলো তো মানলো না? না মানলে কি হবে মৃত্যু থেকে কেউ কি পালাতে পেরেছে? মৃত্যু থেকে পালিয়েছিলাম আমি, মৃত্যুর লোকজন আবার নদী পারে পেয়ে গ্যালো আমায়।

বড় কষ্টে আবার মৃত্যু হলো আমার। দু'বার মৃত্যু হলে কি আর পালানো যায় বলুন? তাইতো আমার ঘামের ভেতর দিয়ে ছুটছে হরিণ, হরিণের পেটে চাঁদ ওঠার গল্পটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। পালানো গ্যালো দ্বিতীয় মৃত্যু থেকে। ব্যাস; ছুরির আঘাত, চুরির আঘাত, এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবী পাড়ি। চুল বাড়ে, কুল বাড়ে, বড় হয় মগজের খুলি। ভুলের ভাষা নিয়ে কারা কারা যেন কীর্তন করতো, ধর্মের স্বাদ লাগলো ওই প্রথম। আমার জন্মের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলাম মৃত্যুর কাছে, মৃত্যুর বাড়ি তখন মরাবাড়ি। জলে ধুয়ে গ্যালো ধর্মের স্বাদ, আমি আবার আটকা পড়ে গেলাম তৃতীয় মৃত্যুর কাছে। ভুলে যাবেন না কোনো মৃত্যুই সহজ নয়। এবার খোঁড়া যাক চতুর্থ মৃত্যুর খাল...

১৯ কার্তিক, ১৪১৪
৩ নভেম্বর, ২০০৭

সতের

মুকুটের পক্ষে যেদিন স্বাক্ষর করেছিল সিরাজ সেদিন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। সেই ভয়েই তো কাউকে বলিনি এতদিন। যেদিন স্বপ্নটা সত্যি হলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। ভালোবাসার পক্ষে যেদিন স্বাক্ষর করেছিলাম আমি, সেদিন কি তোমরা কেউ স্বপ্ন দেখেছিলে? তোমাদের ওই স্বপ্নটা সত্যি হয়ে যাবে বলে ভয় পেয়েছিলে? তবে শোন বন্ধু সেই রাতের তোমাদের দুঃস্বপ্নই সত্যি হয়েছে। দুঃস্বপ্ন হত্যা করেছে আমার স্বপ্নকে। এই জন্য টেরেসিয়াস, ক্রীয়ন কিংবা আর কোনো ত্রিকালদর্শীর প্রয়োজন হবে না, দুঃসময় সত্যি হয়েছে এটাই সত্যি। স্বপ্নগুলো হত্যা হলেও তোমরা একবার দুঃস্বপ্নের আনন্দে বিভোর হতে পারো। কারণ 'স্বাক্ষর' অক্ষরহীন এক জাতি। কিবা মূল্য তার? সোনার মোহর নয় দেহ করেছি দান, কতকাল কত কবুতর গেয়েছে সে গান। দেহ দিয়ে কেহ কি পেয়েছে মন? তাইতো সোনার মোহর।

জুয়েল মোস্তাফিজের বিনিময়ে সোনার মোহরের ওজন কত ভাই? মুকুটের পক্ষে কোনো সাক্ষী লাগে না, ভালোবাসার পক্ষে কারা সাক্ষী দেবে বলো? আমার পক্ষে যে কবিতা, নদী আর সর্বনাশ। জানি নদী কোনো স্বাক্ষর জানে না, সর্বনাশ কোনো স্বাক্ষর জানে না। দেহ দিয়ে পেয়েছি দেহ অবসান, তাইতো সোনার মোহর হেসে ওঠে, হেসে ওঠো তুমি। আমি হেয়ালি বাতাস কারো জামপাতা নাড়াই কারো পালপাতা উড়াই।

১৯ কার্তিক, ১৪১৪
৩ নভেম্বর, ২০০৭

আঠারো

দৃশ্যগুলো নিভে যাবে শীঘ্রই। ভেতরের নির্দেশক তাইতো বলে। সব দৃশ্যগুলো উল্টে গেলে মজাই হতো। কত কত দৃশ্যই তো মারা গেল। আচ্ছা দৃশ্যগুলো মরে কিন্তু উহার সৎকার হয় কোথায়? যখন যেখানে পেয়েছি বুক হাতড়ে দেখেছি কোনো দৃশ্যের সৎকার আছে কি না? কই হাতে তো কিছু বেধে উঠেনি। সবার বুকই ধূসর পৃথিবীর মতো। কারো কারো বুক হারিকেনের কাচের মতো। তবে যে ভেতরের নির্দেশক বলে উঠছে, দৃশ্যগুলো নিভে যাবে শীঘ্রই।

মৃত দৃশ্যের খোঁজে বেরিয়ে গিয়েছিল মোঘলরা, তাদের থলের ভেতর মরা মরা দৃশ্য ছিল, তাদের তেলের ভেতর মরা মরা দৃশ্য ভাসতো। প্রকৃত দৃশ্যগুলো ছিল ওদের জলসা ঘরে। কিন্তু ভেতরের নির্দেশক, তোমার নির্দেশে তার বুকের অলি গলিতে রোদের জাল ফেলেছি তবু কোনো দৃশ্য খুঁজে পাইনি আমি। তবে কি সকল দৃশ্য মরেছিলো ভালোবাসায় আমার। দৃশ্যের তাবিজ ঝুলিতেছে ভাঙনের বড়শিতে। হে মহামহা নির্দেশক, দৃশ্যগুলো অন্য পথে... পৃথিবীর মানুষের বুক খুঁজে মেলেনি কোনো দৃশ্যের সন্ধান।

১৯ কার্তিক, ১৪১৪
৩ নভেম্বর, ২০০৭

ঊনিশ

এতদিন পরে এলে তুমি চলে যাবার জন্য? সারারাত জেগে জেগে ভোররাতের মোহে চোখ দুটো মৃত বেলুন হয়ে আসে। ভোররাত তো সারারাতের কেহ নয়। ভোররাত অন্ধকারের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। তুমিতো জান না ওই দ্বীপেই আমার বলি হওয়া রাত, বলি হওয়া চোখের বেলুন। এতদিন পর ভোররাতের ঠিকানা পেলে তুমি? আচ্ছা ভোররাতে তো মাটির ঘর থাকার কথা নয়? তবু একবার মনে হয় মাটির দেওয়াল, আরেক বার মনে হয় ত্রিবেনী জামতলা, ঘুমের জগতে স্বপনের জগতে জায়গা বোঝা দায়, অনেক দিন পর তুমি এলে অথচ নূপুর পরে এলে না। জানি; রাত পাড়া দিয়ে এসেছো ভোররাতে, রাতের দস্যু খুলে নিয়েছে সে নূপুর। অমন চাঁদ মুখ তোমার হয়ে গেছে মৃত বেলুন। আমি প্রতিদিন ভোরে যে পাখি খেয়ে ফেলি কীভাবে যেন বুঝে গেলে তুমি। আমি তোমার জন্য ললিতকলায় নাচ আনতে গেলাম, সালেক গার্ডেনে মাছ কিনতে গেলাম; স্বপ্নের জগত বড়ই পিচ্ছিল, বেশি জোরে দৌড়াতে পারি না। বিশ্বাস করো কত কত ঘাট মেরে আমার স্বপ্নের জলরসি শাড়িটা আমি পেয়েছি। শাড়িটার ভাঁজ ভাঙার আগে, কান্নামুখর মুখ থেকে চুমুর পাখি উড়ে যাবার আগে, ভোররাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, তুমি চলে যাচ্ছো। আমার বোধ হয় জেগে যাবার সময় হলো, তাইতো তোমার বেঁকে যাওয়া ঘরবাড়ি, তোমার চলে যাবার পথ কড়িকে কেন জানি পরকাল মনে হয়।

২০ কার্তিক, ১৪১৪
৪ নভেম্বর, ২০০৭

বিশ

কোন সীমান্ত কোন দিকে গেছে বিশ্বাস করুন আমি জানি না। আমার জেনেও লাভ কী বলুন? এই যে দেখছেন রোদের পাথর, এই যে সময়ের হাড়হাড্ডি এসব দিয়েইতো আমার তামাসা। তামাসা শেষ হয়ে এলেই আমার সীমান্ত চতুর্দিকে ঘোরে। এই যে বাঁশিটা বেজে উঠছে এটাইতো আসল বিষয়। তোমরা কেন যে সীমান্ত সীমান্ত করে আমাকে আটকে রেখেছো প্রহরী পাড়ায়। যে পথে মানুষ পুড়েছে সে পথেই গেছে তোমাদের সীমান্ত। আমি তখন হাওয়া আর জবা ফুলের মন্ত্র শিখেছি, কতটুকু আর শেখা যায়, এরিমধ্যে আওয়াজ করলেন ঈশ্বর। আমাদের পাগুলো লুকিয়ে রাখা গ্যালো আওয়াজের ভেতর, ওদিকে অন্য এক ঈশ্বরের কাছে সব পথই বিক্রি হয়ে গ্যালো। আমরা তখন খ্যাপা বর্ণের মানুষ, মাছের নামতা, সাঁঝের নামতা, এমন কি সোনাভান মুখস্ত করি। কেউ চিৎকার করলে তার চিৎকার দৌড়ে গিয়ে ধরি। এসবে আমাদের অজু ভাঙতো না, খ্যাপার জলে হাত দিলেই জমে ওঠে আমাদের ওজু। তোমরাতো তোমাদের দইওয়ালাকে চেনো, তার পিঠেই আছে সীমান্তর চিহ্ন। গোটা গোটা মৃত্যু ফোঁকর, মৃত্যুর বিষ্ঠা দিয়ে কাঙালের আর কি আসে যায়, এ পাড়ায় অদ্ভুত এক গন্ধ, প্রহরী পাড়ায় কি সীমান্তের কোনো ঠাঁই ঠোঁকর আছে? আমার মাথা খনন করলেই তোমাদের হারিয়ে যাওয়া সাতশ' কবর কোরাস করে ওঠে।

২৩ কার্তিক, ১৪১৪
৭ নভেম্বর, ২০০৭

একুশ

কেমন আছে ভাঙনের ঘরবাড়ি? বিধ্বস্ত কৈতর ওড়ে পরাণের গহীন অন্দরে? জানি জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া সমস্ত ইঁদুরের আশ্রয় এখন মাটির ভেতর। মাটির সমাজে কোনো বৃহস্পতিবার নেই তবুও বিদীর্ণ রঙ মেখে সমস্ত ইঁদুর বৃহস্পতিবারেই ঘোরে, বৃহস্পতিবারের ওপর ইঁদুর আর মৃত্যু পাশাপাশি ঘুমায়। প্রাণনাথের প্রাণ নিয়ে মাটির কোনো কীর্তন নেই শুধু ভাঙনের পৃষ্ঠায় কারা কারা যেন শব্দ করে ওঠে কারা যেন খ্যাপা হয়ে যায়। পাগল আছে বলেই মাটির এত কদর এমন কথা বলেছিল এক পাগল। মাটি আছে বলেই পাগলের সকাল সন্ধ্যা। এমন কথা শোনা গেছে মাটির গভীরে। জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া সমস্ত মাটিইতো পাথর হয়ে গেছে, সেই পাথরে কারা যেন আঁচড় দিয়ে যায়, ব্যথা লাগে যে? যেভাবে লাগে চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণের কাহিনী শুনেছি বটগাছের কাছে, আর বটগাছের কাহিনী শুনেছি মাটির কাছে। বটগাছ তো বটগাছ নয় সে এক উদ্বাস্তু বৃদ্ধ। জীবনের গভীরে আছে বটগাছের আদি শেকড়। ইঁদুরের পথ ধরে জীবন থেকে পালিয়েছে বটগাছের শেকড়। সেসব শরাহত শেকড়ের আশ্রয় এখন মাটির ভেতরই।

২৪ কার্তিক, ১৪১৪
৮ নভেম্বর, ২০০৭

বাইশ

মৃত্যুর গল্পটা আর কেউ শোনে না। সবাই জেনে গেছে মৃত্যুই পরম আত্মীয়। অথচ মৃত্যুর বাজিগর আমি, মরাউড়ার গল্প শোনাই পথে ঘাটে। এই যে আমার শেষ গল্পটা ঠোঁটের কাছে ঝুলছে তার নাম 'বেগানা মৃত্যু', বেগানা মৃত্যুর গল্পটা কেউ শুনলো না। অথচ আমারই প্রাণের ওপর বেগানা মৃত্যুর বাঁশি বেজে উঠেছে। মানুষেরা তাদের জীবন নিয়ে বড় বেশি বাজিতে মেতে উঠে, অথচ কফিন আর কাফনের দূরত্বে মেতে ওঠে আমার ভেতরের বাজিগর। আমিতো বেগানা মৃত্যুর মানুষ, আমি মানুষকে শোনাতে চেয়েছি বেগানা মৃত্যুর গল্প।

এই যে পৃথিবীর মানুষেরা? বেঁচে আছে এমন একটি মানুষের সন্ধান দিতে পার? যেদিকে তাকাই সেদিকেই মানুষ মৃত্যু পরে থাকে। তোমরাতো বেড়ালের উল্টো পৃষ্ঠা দেখলে না, সেখানেই তো ইলাহা আর মহাকাল চিৎ হয়ে আছে। ইলাহার মৃত্যুর গল্পটা কতকাল আগে তোমাদের শুনিয়েছি। এত সহজেই ভুলে গেলে তোমরা, মানুষ ভুলে যায় মানুষের উল্টো পৃষ্ঠা, অথচ উল্টো পৃষ্ঠায় কত সব ভুলের গল্প। আমি কি ভুলে গেছি শেফালি মৃত্যুর কথা? তাই, আমি মৃত্যুর বাজিগর বাজাই বেগানা মৃত্যুর বাঁশি...

২৪ কার্তিক, ১৪১৪
৮ নভেম্বর, ২০০৭

তেইশ

এই চোখ দেখেই কি তোমরা হেসে ওঠো? অথচ এই চোখে কত ঘৃণার বাস। তোমরাতো তোমাদের বেড়ালের চোখ দেখেছ; জগতের বিরুদ্ধে সে চোখে কত ঘৃণা। এভাবেই তো কাটা হয়ে গ্যালো বিশ্বাসের ডালপালা, পথে পথে কত সব অবিশ্বাসের বৃক্ষ আর তুমি ঘটা করে ডেকেছ ছায়ার মিছিল। বন্ধু; পথিকের কানে কানে কে বলে দেবে, সকল ছায়া ছায়া নয়, সকল ছায়ায় অবিশ্বাস।

কাঙালের চোখ দেখেছো তোমরা? কতবার সে চোখে মহাকাল ডুবে, কতবার সে চোখে ক্ষুধার পৃথিবী হাবুডুবু খায়। মানুষতো ভাগ হয়ে গ্যালো, আর অভাগারা এসে পড়লো বেড়ালের ভাগে। অভাগাদের গানের কথা আজ কিন্তু আমি লিখবো। অভাগাদের জন্য আসলে কোনো রাত নামে না, সকল অন্ধকারেই অবিশ্বাস নামে, সেই অবিশ্বাস মেখে অভাগাদের পা তীর্থের দিকে যেতে যেতে মরে যায়। অভাগাদের এপিটাফে শর্ষে ফুল ফুটে থাকে, শর্ষে ফুলের চোখে দেখেছি শীত শীত ঘৃণা; আরে ভুলেই গিয়েছিলাম! সকল অভাগাই তো শীতকালে মরে...

২৭ কার্তিক, ১৪১৪
৮ নভেম্বর, ২০০৭

চব্বিশ

কথা বলবে বলে কথা দিয়েছিল যে বটগাছ, সে আজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাইতো দাঁড়িয়ে আছি আগুন হাতে, ভাবছি কীভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া যায় পথিকের প্রাণ। ইদানীং অন্ধকারে আর নামে না পথিকেরা। পথিকের প্রাণে বেড়েছে শ্রাদ্ধের জ্বালা। প্রান্তর থেকে ভারতখণ্ডের দিকে চেয়ে দেখি কোনো পথে আর কোনো পথিক নেই, পথিকেরা পথের অবিশ্বাসে গতরাতে পুড়ে মরেছে। জলের ওপর ভুল নৌকাগুলো কেন যে ভেসে থাকে? তবে কি আমিই এ যাত্রার শেষ পথিক। আগুন হাতে দুরন্ত হতভাগ্য।
কথা বলবে বলে কত কথাই না বলতো এ বটগাছ। তার মুখ ফোটাতে কত আগুনই না শ্রাদ্ধ হয়েছে। পাগলের কানে কানে ও মহাকাল তুমি কী বলেছিলে জানি না, তবে বটগাছের কানে কানে পাগলেরা যে গান করেছে সে সুরেরও শ্রাদ্ধ হয়েছে আজ। ভাঙা নৌকার ওপর নামলো পূর্ণিমার চাঁদ, আর তুমি মজিলা রঙিলা হাওয়ায়। কত কত তাড়া খেয়ে কার্তিকের করুণার কাছে আমি দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে দেখি মুখ ফিরিয়েছ তুমি; মুখ ফিরিয়েছে পাহাড়।

এ যুগে কি আর কোনো গুহা আছে? যেখানে ওহির মুখ গুঁজে দেওয়া যায়। পোড়া মুখের কথা বাদ যাক, বাদ যাক এ পথিকের কথা, গতিশুদ্ধ পথিকের কাছেইতো বটগাছ কাঁদে...

২৪ কার্তিক, ১৪১৪
৮ নভেম্বর, ২০০৭

পঁচিশ

চামচিকা, বসে বসে অন্ধকার খাও? আমারে বুঝি দেখ না তুমি? অন্ধকার অপেক্ষা মানুষ কত সুস্বাদু, আহা চামচিকা জানলে না তুমি? বালিয়াডাঙ্গার ঘাটে কালি এসে মুখ ধুয়ে গেছে। তুমি জান না চামচিকা জানলেও না। আচ্ছা কথা বলো তুমি? কতকাল ফাঁসির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সময়, আর তুমি জান না? অন্ধকার খেয়ে কি আর মা কালি শাদা হয়? তাইতো এই ঘাটে মুখ ধুয়েছে কালি, মুখ ধুয়েছি আমি।
জীবনের হা-হুতাশ এত করে বাজে, দেহের প্রাচীর দিয়ে এত সর্বনাশ হাঁটে, তবু ওহে চামচিকা তুমি অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসো। কালের ফ্যাসাদ থেকে আমাদের পাঁজরে কত রক্ত আসে, দেখ না তুমি? মানুষের রক্ত কত সুস্বাদু! ওহে চামচিকা; তুমি ঘড়ির কাঁটার অর্থ বুঝলে না, কেন যে সহজেই বুঝে ওঠো অন্ধকারের রক্তমাংস।

২৪ কার্তিক, ১৪১৪
৮ নভেম্বর, ২০০৭

ছাব্বিশ

জুয়ার আসরে কোনো আঙুলই মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয় জুয়ার সাহেব বিবি। জুয়ার আসরে নাচবে বলে যে মেয়েটি বড় হয় তার চোখের ইশারায় চলে জগতের ট্রেন। এমন কথা মিথ্যা নয়। জুয়ার আসরে নাচবে বলে বড় হয়ে যাওয়া মেয়েটি আর ইশারাঘন ট্রেনের গতিবিধি সত্যের দিকে। তাইতো আমরা জুয়ার দিকে বেঁকে যাই সহজেই। জুয়ার আসর থেকে ছেড়ে যাওয়া সমস্ত ট্রেনই বেঁকে গেছে দুঃসময়ের দিকে। দুঃসময়! তাতে কি? জুয়ার আসরে জ্বলে থাকে এক অদ্ভুত প্রদীপ। যার আলো কালো কালো। আমরা কতকাল ওই প্রদীপের দিকে তাকিয়ে থেকেছি, আর আমাদের মুখগুলো হয়েছে কালো কালো। কালো বলে সে আলো সহসায় অনুজ্জ্বল নয়। জুয়ার আসরে বেড়ে ওঠা স্বপ্নগুলো আর বেড়ে ওঠা মেয়েটির মতো উজ্জ্বল। তবু কত স্বপ্নইতো ভেঙে গ্যালো...

রাত নেমে এলো জুয়ার আসরে, বাড়ন্ত নাচ আর বাড়ন্ত ট্রেনের হুইসেল বাজলো আমার জুয়াড়ি প্রাণে, জীবনের চারদিকে তখন জুয়ার আসর, পৃথিবীর গোপন অন্দরে জুয়ার বিবি মেতেছে তুমুল নাচে, আর তুমুল অন্ধকারের ভেতর আমি তোমাকেই বাজি ধরে ফেলেছি। বড় হয়ে যাওয়া মেয়েটির মতো কীভাবে কীভাবে যেন তুমিও জুয়ার আসর থেকে হাত ফসকে গেলে, তাইতো জুয়ার কাঠিকড়িকে তোমার দেহের কলকব্জা মনে হয়।

২৫ কার্তিক, ১৪১৪
৯ নভেম্বর, ২০০৭

সাতাশ

তিন তাসের এক তাসে দেখেছি তোমার মুখ। তাইতো এই জুয়াড়িখানায় বন্ধ হয়ে গ্যালো সকল সাপ খেলা। পৃথিবীর তলপেটে কত তাস পড়ে আছে। তবু তিন তাসেই বাড়ে জ্বালা, যে তাসের কোনো শুরু নেই শেষ নেই। মহামেরু থেকে এখানকার ঘাট অব্দি ওই তিন তাসই করিতেছে খেলা। যে খেলায় হেরে যাওয়া নেই জিতে যাওয়া নেই। তিন তাসের ডাকটিকিট পরে তোমরা জুয়াতলার মহারাণী বটে? আর আমরা কুলীন মাঝির বকাঝকা খেয়ে বেঁচে আছি। মাঝির পিঠে কখনো দেখিনি কোনো ডাকটিকিটের চিহ্ন, মাঝির বুক ভেসে আছে নদীর ছোবলে।

মহাকালের ডাকঘরে কেউ কখনো কি মাঝির ছায়া দেখেছে? মাঝির ছায়া আটকা পড়েছে তিন তাসের খেলায়। শয়তানের খাবার আনতে গিয়ে বিরুতা মাসি আটকা পড়েছিল জুয়াতলার সীমান্তে, আরো একটা কতবেল হলেই আটকেপড়া রাতগুলো নেমে আসবে বেড়াল পাড়ায়। এত কিছু জেনেও কেন যে তুমি আমাকে দিয়েছো সর্বনাশের ভার। সর্বনাশগুলো মঙ্গার চরে খেলতে নামে, আমি নেমে যাই তিন তাসের গুহায়। সেখানেই দেখেছি তোমার মুখের, তোমার তাসের মহাকাল।

২৫ কার্তিক, ১৪১৪
৯ নভেম্বর, ২০০৭

আঠাশ

লাশকাটা ঘরে কেন যে মেলে না দেহের কলকব্জা, ব্যবচ্ছেদের ছুরির আড়ালে উঁকি মেরে দেখি, দেহের ভেতর ডুবে যাচ্ছে শরবিদ্ধ চাঁদ। তবুও মেলে না উর্দিপরা তাসগুলো। মেলে না মেলে না করে দক্ষিণ পক্ষে দৌড়ে গেছে কুসুমপুরের পাগল। লাশকাটা ঘরে কত মাথা মার্বেলের মতো গড়াগড়ি করে, কই মেলে না তো। মিলবে বলে লাল জলে ডুবেছে পাড়ার পাগল, কই মেলেনি তো। তাই সময়ের পিছু দিয়েছি ছেড়ে, সময়ের ভিত্তি গেছে নড়ে। অমিলের পথে আছে ঘণ্টার ধ্বনি। কেন যে মেলে না তাসকাটা ঘরের খেলা, খেলাটা মিলে যাবে বলে খ্যাপাগুলো চলে গেছে দক্ষিণপক্ষে।

গলায় দড়ি নই। সকল ঘড়িই চলে গেছে নিমগাছের পক্ষে। তাইতো সময়গুলো কেমন জানি আঁধার আঁধার লাগে। তরমুজের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি বালকবেলার ছুরি। তাইতো অন্ধকারের ভেতর তরমুজের ভেতর ছুরিখানা হাতড়াই, তরমুজের কাচে কেটেছে কত জীবনের খরা, কই সময়ের সাথে মেলেনি তো তরমুজের লীলা? মিলবে না মিলবে না বলেই তিতাঘড়ির সময়গুলো লাফায়, আর আমি লাশকাটা ঘরে তোমার কলকব্জা নিয়ে খেলি, মেলে না! কোনো কালই কোনো কালের সাথে মেলে না।

২৬ কার্তিক, ১৪১৪
১০ নভেম্বর, ২০০৭

ঊনত্রিশ

বালকবেলায় লাটিম খেলায় একবার হেরে গিয়েছিল আমার লাটিম। খেলার ধর্মে আর যা হয়। মাথা নিচু করে মাটিতে পোঁতা হয়েছিল লাটিমটাকে। তারপর ধারালো পেরেক দিয়ে মাথা ফাটা হয়েছিল তার। সেদিন খুব ব্যথা পেয়েছিলাম, লাল আলতা মাথায় বেঁধে কি চমৎকার ঘুরতো লাটিমটা। তারপর কেন যে সেদিনের ঘূর্ণি আসরে হেরে গিয়েছিল জোয়ান ঘূর্ণি, মনে পড়ে না। সেই থেকে আজ অব্দি আমার লাটিমটা খোঁড়া মাথার গল্প হয়ে গিয়েছে। সেই থেকেই তো বালক পরাজয় হয়েছে জোয়ান পরাজয়। বহুদিন পর আবার কেন যে কেঁদে উঠেছে সেই পরাজিত লাটিম। অতদিনের ব্যথা এতদিন পর? ভাঙা শানকির ভেতর রেখেছিলাম তারে, সেই শানকির ওপর কতকাল কত সর্বনাশ গ্যালো তবুও তো কাঁদেনি লাটিমটা। আজ হঠাৎ? গল্পটা অনেক দূরের তাই না? কাছে এসো, দেখে যাও আমার ফাটা মাথা, আলতা পরা কপাল। আত্মার ভেতর ঘুরতে ঘুরতে কখন যে থেমে গেছি বুঝতে পারিনি, তারপর জীবনের ধর্মে যা হয়। মাটির দিকে চলে গেছে আমার মাথা, পেরেকের ধর্মের কথা তো তোমাদের জানায়। বালকবেলার লাটিমের মতো আমারো প্রাণের ছাতা ভেঙে গেছে বন্ধু। আমাকেও রাখা হয়েছে দুঃসময়ের ভাঙা হাওয়ায়। হাওয়ার ভেতর থেকে থেকে মনে হয় লাটিম আর মানুষ যতক্ষণ ঘোরে ততক্ষণই মরে...

২৬ কার্তিক, ১৪১৪
১০ নভেম্বর, ২০০৭

ত্রিশ

দাবার ঘরগুলো বড়ই অচেনা লাগে, প্রাণের হাত পাগুলো ভেঙে ভেঙে যায়। অন্ধমানুষের দাবার ঘরে কয়টা সাপ আর কয়টা সময় বোঝা যায় না। তবু কেন যে অন্ধ মানুষেরা দাবার ঘরে প্রকৃত সাপ খুঁজে বেড়ায়? পাগলা হাওয়ায় অন্ধমানুষের কি আসে যায়, কোনো কালের হাওয়া জোটে না অন্ধমানুষের পাতে। অন্ধমানুষের কাছে জবাফুল কোনো ফুল? অথচ জবাফুলের কাছে অন্ধমানুষ ভাঙা চান্দের মতো। তাইতো দাবার ঘোড়া ছুটতে থাকে অন্ধমানুষের চোখে।
ঘর ভেঙেছে যার তারই তো দাবার ঘর। জীবন কষতে বসেছিল ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ। সেই খাতা চুরি করে রেখেছি দাবার ঘরে। দাবার ঘরে আগুন জ্বললে অন্ধগুলো কাঁদে। অন্ধের কান্নার কথা ভেবেও আগুন হাতে ঢুকেছি দাবার ঘরে, পুড়ে গেছে দাবা ঘরের রাজা উজির, পুড়ে গেছে দাবাঘরে লুকিয়ে থাকা অন্ধমানুষগুলো। তবুও খালি পায়ে দাবাঘরে কেন যে অন্ধের মতো আমি ঢুকে পড়ি? আর দাবার ঘরগুলো বড়ই অচেনা লাগে। দাবার ঘরের মাটিগুলো যেন জন্মভূমির মাটি, দাবাঘরেই দেখেছি সিরাজ তিতুমীরের পায়ের ছাপ, দেখেছি এক অন্ধপাগল। যে পাগলেরা তাদের রক্ত দিয়ে মুছে ফেলে সিরাজের পায়ের চিহ্ন। তাইতো দাবার ঘরগুলো বড়ই অচেনা লাগে। দাবাঘরে অন্ধসেনাপতির ঘোড়াগুলো ছোটাছুটি করে আর মনে হয় অন্ধঘোড়ার মতো অন্ধমানুষগুলো কখনো স্বপ্ন দেখে না দাবার ঘরে।

২৬ কার্তিক, ১৪১৪
১০ নভেম্বর, ২০০৭

একত্রিশ

সকল ঘটনায় দুর্ঘটনা। এ কথা লেখা ছিল দুর্ভিক্ষের দিকে যাওয়া এক দেয়াশলায়ের কপালে। আর দেয়াশলাইটিও ছিল একটি দুর্ঘটনা। কিংবা যে আঙুল কেটে এমন কথার জন্ম হলো, সে আঙুলগুলোও এক একটি দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার মতো কত সব চোখের জন্ম হলো, আর

সকল দুর্ঘটনা মিলে গ্যালো তোমার কপালের সাথে। কপালের ঘটনাটা দুর্ঘটনা নাও হতে পারতো। ওই যে সেদিন, কারা যেন বলে গ্যালো কদম ফুলের গাছটাও নাকি দুর্ঘটনা। কদমফুলের গাছটা অন্তত দুর্ঘটনা নাও হতে পারতো।

কিন্তু তাতো আর হবার নয়, সবই দেয়াশলায়ের কপাল। কপালের রাস্তায় বেড়াল পায়ে কারা যেন আসে যায় ঠাহর করতে পারি না। তবে কি বেড়াল একটা দুর্ঘটনা? মৃত্যু মাথায় করে বেড়ালগুলো ঘাপটি মেরে বসে থাকে, দেখে দেখে মায়াও লাগে। তবে কি মায়ার ভেতর চলে গেছে দুর্ঘটনার পিতা? নইলে এত ঘটনার জন্ম কীভাবে হলো? তোমার দেওয়া প্রথম কদম ফুল সেও নাকি দুর্ঘটনা। মিথ্যা হয়ে গ্যালো এই হাত, মিথ্যা হয়ে গ্যালো এই দেহ, উপত্যকার পথে দেয়াশলাই সত্যগ্রহ। দেয়াশলায়ের প্রতিটি কাঠিই আগুনের ইতিহাস। আগুনের ইতিহাস পড়তে পড়তে পুড়ে যাই আর জগতের সকল ঘটনায় চলে যায় দুর্ঘটনার দিকে।

২৮ কার্তিক, ১৪১৪
১২ নভেম্বর, ২০০৭

বত্রিশ

মাগো, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এই কার্তিকের সন্ধ্যা। তবুও তুমি বলছো খোকা ওঠ? আর আমি সুলতানের ঘোড়ার মতো ছুটে যাই জন্মের দিকে। রক্তের বয়সের সাথে কেন যে আমাকে রোজ রোজ দাঁড় করাও। কই? কোনো দিন তো রক্তের বড় হওয়া গ্যালো না, কিংবা সমানও না। তবে কেন হুমড়ি খাওয়া এই কার্তিকের সন্ধ্যাকে ধুলো ঝেড়ে তোলো? মাগো, আমার কপালের নজর তিলক চুরি গ্যালো বলে, দৌড়ে গেলে ডাহুকের কাছে, ডাহুকের বাড়িতে সেদিন কুহক ছিলো, বেলা অবেলা আঁচলে বেঁধে তুমি বসে আছো ডাহুকের দহলিজে, আর আমি কপাল থেকে নজর তিলক মুছে মুছে কার্তিকের সন্ধ্যা রাঙাই। কার্তিকের সন্ধ্যার মাচান ভেঙে পড়েছে মা। তবুও তুমি যেন বলে উঠছো খোকা ওঠ?

আর আমি ভোরের আলোর মতো ছুটে যাই মৃত্যুর দিকে। ওদিকটায় তুমি কতদিন করেছ বারণ তবুও প্রাণের অবাধ্য বাতাস সেদিকেই ভেসে যায়। যেতে যেতে দেখি তোমার প্রাণের প্রাচীর, প্রাচীরের ওপর উড়ছে আমার জন্মের রক্তমাখা শাড়ি। মা, যে বড়শিতে বিঁধে গিয়েছিল আমার জন্ম, সেই বড়শিতেই কত কেটেছে পা। আমার জন্মের পাশে

আমার জন্মের বড়শি কাঁদে, আর সেই কান্না শুনে শুনে আমি হয়ে উঠি কার্তিকের সন্ধ্যা; কেন যে কার্তিকের সন্ধ্যাগুলো রক্ত রক্ত লাগে, রক্তমাখা গর্ভের ভেতর আমি কি বড় বেশি ঘুমিয়ে পড়েছি মাগো? তবে কেন কানে কানে বাজে খোকা ওঠ! খোকা জন্ম নিবি না তুই? তবে কি জন্মের লোভে আমিই বারো বানের ভেসে ওঠা জল। মাগো..., ওমা...!

২৮ কার্তিক, ১৪১৪
১২ নভেম্বর, ২০০৭

তেত্রিশ

এবারের শীতে আমি বাঘের কাছে যাবো। বাঘের হাতে পায়ে ধরে বলবো সূর্যের সাথে তোমার বিরোধ মেটাও। সংখ্যাটা এবার হয়ে গ্যালো তিন। কোনো মৃত্যুর সংখ্যা তিন হলে কোনো শালিকের সংখ্যা তিন হবে না। হবে না বলেই সূর্য, বাঘ, আর মানুষ পার্থিব হয়ে ওঠে। সূর্যের সাথে কীভাবে কীভাবে যেন বাঘেরা মেতে ওঠে। যেভাবে ক্ষুধার সাথে মেতে ওঠে সময়। সংখ্যাটা এবার হয়ে গ্যালো চার। কোনো মৃত্যুর সংখ্যা চার হলে কোনো বেজির সংখ্যা চার হবে না। হবে না বলেই সূর্য, বাঘ, মানুষ আর সময় আদর্শ হয়ে ওঠে। মানুষের সাথে কীভাবে কীভাবে যেন সময়েরা খেলা করে। নারীর সাথে যেভাবে মেতে ওঠে অন্ধকার। সংখ্যাটা এবার হয়ে গ্যালো পাঁচ। কোনো মৃত্যুর সংখ্যা পাঁচ হলে কোনো কবিতার সংখ্যা পাঁচ হবে না। হবে না বলেই সূর্য, বাঘ, মানুষ, সময় আর তুমি সর্বনাশ হয়ে ওঠো। সর্বনাশ আর তোমার সাথে কীভাবে কীভাবে যেন আমার সখ্য গড়ে ওঠে। যেভাবে পালোয়ানের বর্শার সাথে শত্রুপক্ষের শরীর। বন্ধু; তুমি বন্ধুর ঘরে আগুন দিলে, আর কোনো সংখ্যা বাড়বে না জানি তবু মাঝে মাঝে নামতা খাতা খুলতে ইচ্ছে করে; বাঘ, সময়, মানুষ আর তুমি।

২৮ কার্তিক, ১৪১৪
১২ নভেম্বর, ২০০৭

চৌত্রিশ

আমার জন্মপক্ষ থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেন যেখানে থেমেছে, সে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে তিতাসময়ের গাছ। গাছটার নাম তিতাসময় হয়ে গ্যালো; কারণ গাছটার আচরণ ছিল অনেকটা মানুষের মনের মতো। মানুষের মন বোঝা বড় দায়, হাটখোলার পড়ন্ত বৃদ্ধ কাশির ঝড় থামিয়ে বলেছিল এ কথা। তিতাসময় থেকে যে ট্রেন আমার জন্মের দিকে গেছে সেখানেও রয়েছে একটা নিমগাছ। যে গাছের পাতাগুলো বৃষ্টির মতো শাদা। শাদা বলেই তোমাকেই চেনানো গিয়েছিল সেখানে যাবার পথ। তুমি দিয়েছিলে দৌড়। নিমগাছের ডালে ঝুলছে আহত কত রাজহাঁস। হাঁসগুলোর কান্না দেখে ফিরেছিলে তুমি। তাই দস্যু হাওয়ার কবলে চলে গেছে তোমার প্রাণ। আমার জন্মপক্ষ থেকে প্রতিদিনই ছেড়ে যায় ট্রেন, তিতাসময়ের দিকে। শুনেছি তিতাসময়ের গাছে অনেক মিঠা মিঠা পিঁপড়া লেগেছে, মিঠা পিঁপড়ার মোহে ওগো জন্ম আমার তুমিও চলে যাও মৃত্যুর দিকে। আর আমি বসে থাকি তিতাসময়ের তলে, সেখানে আহত কত রাজহাঁস পাখাসাপটায়। তিতাসময় থেকে আমার জন্মপক্ষে আর কোনো ট্রেন যাবে না জানি তবু অসম্ভব স্টেশনেই হাঁটাহাঁটি করে দিন যায় দিন আসে...

২৮ কার্তিক, ১৪১৪
১২ নভেম্বর, ২০০৭

পঁয়ত্রিশ

শত্রুর কাছেও আমি মধু বিক্রি করি। শত্রু পক্ষের গোলাঘরে আমারও একটা পক্ষ আছে। যে পক্ষের তীরে মানুষের ঘুমের মাছি ওড়ে। তোমার ঘুমও আমার একটা পক্ষ। শত্রু মরে গেলে প্রান্তর যেন শূন্য শূন্য লাগে, তাইতো দূরসম্পর্কের শত্রুর কাছেও আমি মধু বেচে খাই। মধু আর শত্রু দু'জনেই বাড়ন্ত খাদক। কেরসিনের গন্ধেই এরা মেতে ওঠে। কেন জানি শত্রুর হাসিও ভালো লেগে যায় আর মধুগুলো মেতে ওঠে জন্মের মুহূর্ত হতে।

শত্রুর দিক থেকে তীর ছুটে এলে আমার কিন্তু ভালোই লাগে। আর ভালো লাগে বলে আমিও তীরের শরণাপন্ন হই, শত্রুর জন্য কেন যে আমি মধু বেছে নিয়েছিলাম মনে করতে পারি না। শত্রুর তালগাছ উঁচু উঁচু লাগে তাই ভয়ে আমি বাঘের পিঠে চড়ে দূর দিয়ে যাই। দূরে গেলেও কি বাঁচান আছে? শত্রু পক্ষ কাছেই থাকে। কেন জানি শত্রুর মায়া মরার ফাঁদে আহুতি হয়ে বাজে। মৃত্যুর খাপ হতে বেঁচে যায় আমার মাথা। তাইতো আমি মধু চাষে আরো বেশি পারদর্শী হয়ে উঠি। যত মধু তত শত্রু। তাইতো শত্রুর জ্বরের দিনে আমি তাপের দিকে যাই, তাপ থেকে খুলে আনি শাদা শাদা টুপি। শত্রুর কাছে আমি টুপিও বিক্রি করি। যে টুপি পরে শত্রুপক্ষ আমার দিকে ছুড়ে মারে আহুতির কাঠি। কেন জানি শত্রুর সব বেলায় শত্রু নয়, কোনো কোনো বেলায় শত্রুর ঢোলে আহুতি বাজলেও, শত্রু কেবল শত্রুই থাকে।

২৯ কার্তিক, ১৪১৪
১৩ নভেম্বর, ২০০৭

ছত্রিশ

চোখ বন্ধ করলেই কত সব শুয়োর দেহের ভেতর ঢুকে পড়ে। তারপর দেহের দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে শাদা হয়ে যায়। দেহের ভেতর সর্বশেষ শূকর আটকা পড়েছে জেনেও চোখ খুলে যায়। আর শাদা শূকর থেকে উলুধ্বনি আসে। তাইতো প্রাণের এত ছোটাছুটি। প্রাণের রাজহাঁস খুঁজেছিলাম কসাইয়ের মোটাবাটের ছুরিতে। তাইতো আটকেপড়া শুয়োরটা পিঠের দিকে ছটপট করে। বড় অভিমানে কাঙালের কান্নায় ডুব দিয়েছে রাতের মাঝি; ভয় লাগে, ভয়ে ভয়ে স্বপন দেখি, স্বপন দেখতে দেখতে সুলতানের দাসীর ঘরে ঢুকে পড়ি। ক্লান্ত দাসী দীর্ঘ রাতের দায় সারে। ভাঙা খাটের ওপর ফিরে আসে আমার স্বপন। ইদানীং বুকের ডাকঘরে ঘটাং ঘটাং শব্দ হয়, তবে কি দেহের ভেতর সমস্ত বেড়াল চিঠি হয়ে যাবে? যত রাত তত চিঠি, বুকের ডাকঘর থেকে নিমকালো চিঠিগুলো কোন ঠিকানায় যাবে, সেই ভাবনায় বুকের ডাকঘরে বেড়ালগুলো লাফালাফি করে।

বেশ্যা হলে কী হবে? বেশ্যাই আমার জন্মভূমি মাসি। কতবার বেশ্যা মাসির দুগ্ধ করেছি পান শৈশবে, তখন তার বুকের প্রান্তরে দেখেছি, তরবারি আর ঘোড়ার খুরের চিহ্ন। তোমরা মেতে উঠতে মাসির উর্বরখণ্ডে আর আমাদের জন্ম হতো বাদুড়ছানার মতো। আমাদের নাম দিয়েছিলে ক্রীতদাস, কালো। কালো বলে আমাদের আস্তাবলে সমস্ত ঘোড়ার জন্ম ধূসর আর অন্ধকারের মতো। আমাদের প্রেমগুলো আফ্রিকার পূর্ব আকাশের মতো মায়াময়। আমাদের নদীগুলো কেমন জানি বেশ্যা বেশ্যা লাগে, আমাদের ধর্মবাড়ি, কর্মগাড়ি, আমাদের আকাশগুলো বেশ্যা মাসির মতো মায়ার। আমাদের চেনার জন্য ওই কালো কালো শূকরগুলোর পিছু নিলেই যথেষ্ট, যখন চোখ বন্ধ করি ওরা আমাদের দেহের ভেতর ঢুকে পড়ে, আর শাদা শাদা হয়ে যায় দেহের দক্ষিণ দিকে।

৩০ কার্তিক, ১৪১৪
১৪ নভেম্বর, ২০০৭

সাইত্রিশ

ডাস্টবিনের গায়ে কোনো শীত লাগে না তাই ডাস্টবিন বড় বেশি পরিতাপ হয়ে ওঠে। ডাস্টবিনের বাম পাঁজরে শীতের জন্ম হবে বলে নীল মাটির কেঁচোগুলো ঘুমহীন রাত জাগে। ডাস্টবিনও সারা রাত জেগে থাকে জগতের সর্বশেষ শিশুটির কান্নায়। পরিত্যক্ত মনের পাহাড়ে যে ফুল ফোটে তার কোনো গন্ধ নেই। অথচ ডাস্টবিনের চোখে কাঁদছে মহাকাল। মহাকালের কান্নার জন্য সবাইকে ডাস্টবিনের অনুসারী হওয়া উচিত। জীবন যে কেন বেঁকে যায় ডাস্টবিনের দিকে, ডাস্টবিন তো পরিত্যক্ত নগরের ইতিহাস। সে ইতিহাসে ব্যথার লোকনাথ উল্টে পড়ে আছে। ডাস্টবিনের ইতিহাস লিখতে এসেছিল কালো মানিক, সে ইতিহাসে দৌড়ে গিয়ে দেখেছি, শুধু কালো ঘোড়া আর কালো কালো শিশুরাই কাঁদে। শিশুর কান্নার সাথে ডাস্টবিনের কান্না এতবার মিলে গ্যালো তবু মহাপৃথিবী জাগলো না। পৃথিবীর প্রথম কষ্ট ডাস্টবিন। ডাস্টবিনের শেষ কষ্ট শিশুর কান্না। কত অন্ধকার ডাস্টবিনের দিকে চলে যায় আর ফিরে আসে জাগতিক বৈভব, কত করুণা ডাস্টবিনের জলসায় বাজে, আর ডাস্টবিনে ঢুকে পড়ে কুলীন ইতিহাস। ওদিকটায় শুধু ধুলো ওড়ে, প্রাচীন গ্রামের ধুলো। ধুলোর ভেতর হাওয়াগুলো মরে গেলে ধুলো হয়ে যায় মৃত্যুর উচ্ছ্বাস আর সকল মৃত্যুর কবর আছে ডাস্টবিনের বুকে। বহুদিন পর আমি পচা জীবনের কাছে লিখিতেছি চিঠি, পচা শামুক পেয়েছে আমার মাতৃ আদর। তবু ডাস্টবিনের কাছেই মাঝে মাঝে ঘুমাতে যায় আমার ঈশ্বর। আর আমি বৃদ্ধ বাতাসের সাথে ভারী হয়ে উঠি। থেকে থেকে ডাস্টবিনগুলো পরিত্যক্ত ব্যথায় ভারী ভারী চিৎকার করে।

১ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
১৫ নভেম্বর, ২০০৭

আটত্রিশ

আগুন লেগেছে পুবে আর তুমি জোয়ান ইলাহার সাথে চলে যাও কোথায়। তোমাকে খুঁজতে এসেছিল মোঘলের রক্ত, আমি বলেছি তিতা ঘোড়ার কথা। তোমাকে না পেয়ে সময়কে ধরে নিয়ে গ্যালো ওরা, জোয়ান মোঘলের সাথে চলে গেছে সময়। এসব হাটে ঘাটে নিঃশ্বাসের তেমন কদর নেই, নইলে কি আর বেঁচে থাকি কচ্ছপের ঘরে? জন্মভূমির সাথে একবার দেখা হয়েছিল অন্ধকার বন্দিশালায়। শুনেছি কাল রাতে ছাড়া পাবে জন্মভূমি। গঙ্গার জলের সাথে কেমন করে যেন ঈশ্বরের সম্পর্ক বেড়ে গ্যালো। তাইতো গঙ্গার জলে দেখা হয়েছিল বন্দি ঈশ্বরের। আগুন লেগেছে উত্তরে আর তুমি জোয়ান চাঁদের সাথে চলে যাও কোথায়। তোমাকে খুঁজতে এসেছিল মঙ্গার ক্ষুধা, আমি বলেছি জন্মভূমির সাথে বন্দি আছো তুমি। কাল রাতে ছাড়া পাবে বন্দিশালার অন্ধকার, কাল রাতে ছাড়া পাবে জন্মভূমির আটকানো গলা। এসব জেনেও কেন যে আগুন লেগেছে অসহায় ভেড়ার গায়ে? মানুষ এসেছিল খোঁড়া পৃথিবীর খোঁজে। আমি বলেছি জোয়ান বেদেনির সাথে ঘুমিয়ে আছে খোঁড়া পৃথিবী, যেখানে সময় নেই সেখানে বাড়ছে ধুতুরা গাছের ছায়া, সেই ছায়া দেখে দেখে কত সব অন্ধমানুষ হিসাব করে রাত আর দিন। পাগলের রাতে একাত্তরটি চাঁদ হাসতে হাসতে খসে পড়ে। পাগলের দিনে আগুন লেগেছে, পাগল তাই চেয়ে আছে কাল রাতের দিকে। কাল রাতেই জন্মভূমি ছাড়া পাবে।

২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
১৫ নভেম্বর, ২০০৭

ঊনচল্লিশ

খরগোশের ইতিহাস লেখার আগে আমরা আরো একবার সূর্যের কাছে যেতে পারি। সেখানে যদি খুরের চিহ্ন না থাকে তবে কখনোই বলবো না যে, তোমার পরিত্যক্ত খোপার ভেতরেই খরগোশের জন্ম। খরগোশের পায়ের দিকটা দেখলেই সূর্যের সাথে অন্য পৃথিবীর বিরোধ বাড়ে। তাইতো অধিকাংশ বৈঠকে কাঁচা কাঁচা খরগোশ পাওয়া যায়। আমি কখনোই বলবো না যে, কাঁচা কাঁচা খরগোশগুলো তোমাকে চিনিয়েছিল অন্ধকার। খরগোশের উল্টোচোখে হঠাৎ মারা গ্যালো পথের বানিয়া। পথের বানিয়া মারা গেলে অন্ধকার বেয়াড়া হয়ে যায়, খরগোশের ইতিহাস লেখার আগে আমরা আরো একবার তোমার ইয়াবা অন্তর খুঁজে দেখতে পারি, লাঙ্গলের ফলার মতো সেখানে কোনো পাপ আছে কিনা?

খরগোশের পিঠে খুঁজেছি তোমার পাপ। সকল পাপ তাপ হয়েছে খরগোশের ভেতর। তাহলে কি তাবিজের ওপর ভর করলেই চলবে? তাহলে কি ডাকতে হবে বানিয়া বন্ধুর মৃত্যু? সেই মৃত্যুর ওপর কত জ্বর চড়েছিলো কে জানে। জান নাকি তুমি কখন কখন খরগোশের মাংসে সুবর্ণ নেমে আসে? অবিশ্বাসের পথে তুমিই ভরসা, তোমার ছায়ার ভেতর দেখেছি মরা মরা খরগোশ।

২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
১৫ নভেম্বর, ২০০৭

চল্লিশ

আঠারো বছর কোনো প্রেমিক কিংবা যুদ্ধের বয়স নয়, আঠারো বছর নীলকণ্ঠের ক্ষুধার বয়স। ক্ষুধা বেড়ে বেড়ে আঠারো বছর, যুদ্ধ বেড়ে বেড়ে আঠারো বছর। তাইতো নীলকণ্ঠের আঠারো বছর আটকা পড়ে আছে তালতলার গারদে... আঠারো বছরে ফুটে আছে অনেকগুলো জবাফুল, আঠারো বছরে উঠে আছে অনেকগুলো ভুল। তাইতো ওই আঠারো বছরের পাশাপাশি আরো কিছু আঠারো বছর করিতেছে খেলা। আঠারো বছরে কোনো মৃত্যুর ইতিহাস নেই অথচ এক অন্ধসেনাপতি আঠারো বছর পাড়ি দিয়েছিল তার মৃত্যুর বছরে। ওই অন্ধসেনা কত বছর বেঁচেছিল কে জানে। কত কত বছর হাওয়ায় ভাসে তবু নীলকণ্ঠের আঠারো বছর দাঁড়িয়ে আছে বটগাছের সাথে। একটি গাছের কত বছর পেরুলে সে গাছ বটগাছ হয়ে যায়? দুঃখের বছর পাড়ি দিয়ে নীলকণ্ঠের আঠারো বছর চাঁদের কথা বলে। চাঁদের মাসিক বেদনায় আঠারো বছর রক্ত আর কালি। রক্তের দিকে পৃথিবী তাই বেঁকে যায়। এই কার্তিকের ঝড়ে নীলকণ্ঠের আঠারো বছর হামাগুড়ি পাড়ে রক্ত কুমারীর দিকে। শুনেছি কুমারীর প্রথম রক্তে অন্ধ হয়েছে নিমগাছ, অন্ধ হয়েছে চাঁদের আঠারো বছর। আঠারো বছর তীর চালানোর উত্তম ঋতু। তাইতো সাঁওতাল বানিয়া তীর হাতে ঘোরে আঠারো পাড়ায়। আঠারো বছরের সিন্ধুকে সাপের ইতিহাস নেই। তাইতো বছর ঘুরে ঘুরে আসে নীলকণ্ঠের আঠারো বছর। আঠারো বছর কোনো বিজয়ের চিহ্ন নয় তবু নীলকণ্ঠের আঠার বছরের কাছে হেরে গেছে পৃথিবী, শুনেছি পৃথিবীর মৃত্যুর আঠারো বছর পর নীলকণ্ঠের আঠারো বছরের জন্ম। শুনেছি নীলকণ্ঠের আঠারো বছর মরে যাবার পরও অভিমানে দাঁড়িয়ে আছে নীলকণ্ঠেরই আঠারো বছর।

৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
১৫ নভেম্বর, ২০০৭

একচল্লিশ

ভাঙা প্লেটের ওপর ভেঙে পড়েছে শৈশব। তাইতো সিগারেটের খাপগুলো আরো একবার গুনি। বাপের ভিটায় বড় হয় বিষবৃক্ষ আর আমি শঙ্খবাসের আশায় সে বৃক্ষে ঢেলেছি জল। জল আর সর্বনাশ, আমার প্রাণের ওপর বড় হওয়া পৃথিবী। অস্থির পৃথিবীতে সুলতানি মন কেন যে যুদ্ধে মেতে ওঠে। জীবনের টাট্টু ঘোড়া পড়ে আছে শৈশবের পথে, তাইতো ভাঙা পথের ওপর ভেঙে পড়েছে জীবন, ভাঙা পাঁজরে ভেঙে পড়েছ তুমি। তোমার বাতাসে এত ঘূর্ণিঝড় ওঠে? পৃথিবীর সর্বনাশের এত ক্ষুধা? আমরা দক্ষিণে বেড়েছি সর্বনাশের খাবার, সর্বনাশ তুমি মেতে উঠলে দক্ষিণে...

বড় হয়ে যাওয়া কিশোরীর পায়ের আলতা বড় হলো না বলে, চাঁদের পাশে বসে বসে শৈশব কাঁদে, শৈশবের ওপর দিয়ে সাপ চলে যায় তবুও ফিরে আসে না শৈশবের চাঁদ। দক্ষিণে আর চাঁদ উঠবে না জানি, ঘূর্ণিঝড়ে খুলে পড়েছে চাঁদ। একি সর্বনাশ করেছ তুমি? অমন বাতাসে ভাতের ফড়িঙ উড়িয়ে দিলে। দক্ষিণের শৈশবগুলো ডুবে গ্যালো, দক্ষিণের জোয়ানগুলো উড়ে গ্যালো ঝড়ে। দক্ষিণে এত মরা, শুনেছি মরেছে হাজার হাজার, সে মৃত্যুর ভেতর কি ভিক্ষুক ছিল না? সে মৃত্যুর ভেতর কি শৈশবের টাট্টু ঘোড়া ছিল না? তাইতো মৃত্যুগুলো গুনি, বরগুনার বাজারে এত মায়ের মৃত্যু? মৃত মানুষ স্বরবর্ণ ভুলে যায়। তাইতো ভাঙা সময়ের ওপর ভেঙে পড়েছে তোমার দক্ষিণ পক্ষ। আর শঙ্খবাসের আশায় বাপের ভিটায় ঘূর্ণিঝড় মেতেছে দারুণ।

৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
১৫ নভেম্বর, ২০০৭

বিয়াল্লিশ

এখানে এক হাজার মায়ের মৃত্যু ঘটেছে। তাইতো এক হাজার সন্তান ঝড়ে হয়েছে নিরুদ্দেশ। এখানে ভিটামাটির মৃত্যু হয়েছে। তাইতো ঘন ঘন আযান পড়ছে। আযান শেষ হলে আরো কিছু মৃত্যু বাড়ে। যার ভেতর শিশু আর বৃদ্ধ, গাছ আর গবাদিপশু। এখানে ভাতের মৃত্যু হয়েছে তাইতো সূর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে মেতে উঠেছে ক্ষুধা। কিছুক্ষণ পর ক্ষুধার মৃত্যু হবে তাইতো আযানের চলছে প্রস্তুতি। এবার আযান শেষ হলে আরো কিছু মৃত্যুর খবর আছে। মরে গেছে কুলসুমের শ্বশুর বাড়ি, মরে গেছে কুলসুমের বাপের বাড়ি, তাইতো কুলসুমের শাড়িখানা বাড়ছে, মাটির মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হবে জলের, তাইতো মরা নিয়ে কুলসুম উঠেছে হাওয়ায়। কিছুক্ষণ পর কুলসুমও মারা যাবে...
তবে কি বেঁচে থাকবে কুলীন সর্বনাশ, সবকিছু মরে গেলে পরাহত আর পরাজয় বেঁচে থাকে। মৃত্যু কিংবা সময় নিজ হাতে ইতিহাস লিখতে পারে না তাই ইতিহাস সবকালের কলঙ্ক নাও হতে পারে। তবে কি বেঁচে থাকবে ভারী ভারী কান্না, মারা গেছে একুশের প্রথম প্রেমিকা, গতকাল ঝড় হয়েছিল খুব। মারা গেছে পাগলের সর্দার। এসব মৃত্যু হয়তো একদিন সুখী মানুষের খাতায় ইতিহাস হবে, কিন্তু মৃত মানুষের খাতায় থাকবে চিরকাল শূন্য। গতরাতে সিডরের অভিশাপ লেগেছে, মরেছে এক হাজার হরিণ, তাইতো এক হাজার শিকারি ঝড়ে হলো নিরুদ্দেশ।

৫ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
২৮ নভেম্বর, ২০০৭

তেতাল্লিশ

বাবুলালের কপালে কোনো ডাকটিকিট নেই, তার শার্টের ভেতর আহত এক টিকটিকির বাস। এই দিয়ে কি আর বাবুলালের পরিচয় দেওয়া যাবে? পৃথিবীতে কি আর স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল আছে? কপালের যুদ্ধে টিকটিকি হেরে গেছে, তাইতো বাবুলালের শার্ট টিকটিকির প্রাচীর। প্রাচীর দিয়েছে অন্ধকারের রাজা, বাবুলালের বুকের ওপর কত প্রাচীর উঠেছে ভেঙেছে, কোনো প্রাচীরে কোনো টিকটিকি পাওয়া যায়নি। সকল টিকটিকি মারা পড়েছে কপালের যুদ্ধে। তাইতো বাবুলালের শার্টই টিকটিকির আদর্শ ঘর। ওই যে, যে বছর বড় বেশি অন্ধকার নেমেছিল, পাড়ায় পাড়ায় দুঃখ তাড়ানি সংঘ; সেদিন বাবুলাল টিকটিকির কথা বলেছিল আর বাবুলালের পিঠের ওপর এক দঙ্গল শেয়াল হুক্কাহুয়া, হুক্কাহুয়া। বাবুলালের ঘরে সেদিন চৈত্রমাস। আগুনবালা নেচে উঠেছে, তাই পুড়ে যাচ্ছে বাবুলালের ঘর। পোড়াঘর মাথায় করে বাবুলাল চলে যায় মহাপৃথিবীর দিকে, সেই দিকে নাকি অন্ধকার আর শেয়াল মহাপৃথিবীর প্রাচীর হয়েছে। তবুও আহত টিকটিকিরা বাবুলালের ঘরের কাছে চিৎকার করে। 'বাবুলাল কোথায় চলে যাও?' বাবুলাল চলে গেছে মহাপৃথিবীর বাড়ি। মহাপৃথিবীর বাড়িতে যারা যারা পৌঁছে যেতে পেরেছিল তাদের মধ্যে কেবল বাবুলালের কপাল ছিল ডাকটিকিটহীন। তার পরাণের ভেতর আহত টিকটিকির মিছিল ছিল। তার শার্টের ভেতর ছিল আহত টিকটিকির ঘর। তাইতো ঘরের প্রাচীরগুলো কেমন জানি অবিশ্বাসী লাগে, অন্ধকার আর শেয়াল চুরি করেছে ঘরের প্রাচীর। রণাদা'র দোকানে বাবুলাল আমাদের আগুনবালার গল্প শোনাতেন, যে গল্পের ভেতর প্রাচীর ছিল, টিকটিকি ছিল কিন্তু কোনো ডাকটিকিট ছিল না...

৫ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
২৮ নভেম্বর, ২০০৭

চুয়াল্লিশ

এক দুঃসময় আরেক দুঃসময়ের সাথে গলাগলি করছে দেখে, আমি অন্য এক দুঃসময়ের কাছে আশ্রয় নিই। এই আশ্রয় নিরাপদ নয় জেনেও আঘাতের তীরগুলো খুলে ফেলি পাঁজর থেকে। সময় ঘুরে দুঃসময়ের ঘরে যে পূজা আসে, সে পূজাতেও আমি পোড়াই ধুপ। ধুপের গন্ধগুলো সত্য নয় জেনেও, দুঃসময়ের পূজায় আমি পুরোহিত থাকি। আমি জানি তুমি বীণার তারেই নাচো। তাইতো দুঃসময়ের তারে নাচে সর্বনাশ। নাচের মুদ্রা দিয়ে এখন আর সময় কিনতে পাওয়া যায় না, সকল সময় বেঁকে যায় দুঃসময়ের দিকে। এক দুঃসময় থেকে আরেক দুঃসময় একটি শীতের ব্যবধান; আর শীত হলো দুঃসময়ের মুদ্রা। তাইতো ভাবছি এই দুঃসময় ছেড়ে চলে যাবো শীতের দিকে সম্ভবত সেখানে আত্মার ঠিকানা আছে। আত্মা আছে বলে মানুষের মুদ্রা সময় পাড়ি দেয়। আর আমি একটু একটু করে খরগোশগুলো তুলে রাখি সিন্ধুকে। দুঃসময় পাড়ি দেওয়ার খরচ হিসাবে খরগোশই আদর্শ খরচ। সময়কে তুমি শৈশবের নাড়ু ভেবেছ? সময়ের ঘোড়া ছুটে যায় আগুনমুখো দুঃসময়ে। জীবনকে তুমি বকুলতলার বালক ভেবেছ? জীবন ছুটে যায় তরবারির ধারে। তাইতো রোজ রোজ মেতে উঠি সময়ের খেলায়, খেলা শেষ হতে না হতে দুঃসময় চলে আসে, আর প্রাণের খোয়াড় থেকে লাফিয়ে পড়ে খরগোশগুলো। দুঃসময়ের খরচ জোটাতে প্রাণ আর প্রান্তরে খরগোশের প্রজনন মেতে ওঠে। তাইতো বলি বন্ধু, যতই বাজুক সময়ের মুদ্রা, সাবধান! একটি দুঃসময় থেকে আরেকটি দুঃসময়ের ব্যবধান কেবল একটি শীতকাল।

৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
১৯ নভেম্বর, ২০০৭

পঁয়চল্লিশ

আমি পানশালার জুয়াড়ি বটে, তাই বলে কি তোমাকেও বাজিধরা যায়। শিকারির নীল চোখে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া পাখির জন্য কোনো হত্যা নেই বন্ধু, সে পাখির রঙ হলুদ। অশোকের তরবারি সাক্ষী, এই জনপদে আর কোনো হত্যাকারী নেই যে তার প্রেমিকাকে হত্যা করেছে। ওথেলোর প্ররোচনায় মাতাল হয়েছ তুমি? আমি ইতিহাস থেকে পালিয়ে আসা জল্লাদ বটে, তাই বলে কি তোমাকেই ফাঁসি দেওয়া যায়? ফাঁসির কাঠের ওপর কত সব মৃত্যু মেতে ওঠেছে, নমরুদের নগর থেকে এখানকার প্রাচীন জনপদে কত মৃত্যুর বাঁশি বাজলো। কই? কোথাও তোমার মৃত্যু খুঁজে পাইনি। আজ হঠাৎ প্রাণে বেঁধেছ মৃত্যুর ফাঁদ। আর আমাকে করেছ দায়ী? আমি দাহযজ্ঞের প্রথম পুরুষ বটে, তাই বলে কি তোমার দেহের সোনার মাটি পুড়িয়ে দেওয়া যায়? একজন হত্যাকারীর ঘুমের ভেতর ছেড়ে দিয়েছি ফড়িঙ, কই কোনো ফড়িঙের পাখায় কোনো রক্ত ছিলোনাতো। তবে কি হত্যাকারীর স্বপ্নের ভেতর সবুজ ঘাস? তবে কি শিকারির অন্ধকারে সকল মানুষ অন্ধকার? এসব প্রশ্নের ভেতর শুধু তোমার মুখখানি ভাসে, অন্ধ খুনির মতো আমি তোমার মুখখানা হাতড়াই, হাতে বাধে ছোটবড় পাথর। কেন যে তুমি হয়ে গেলে আধেক অন্ধকার। আমি রাতের চোর বটে, তাই বলে কি তোমার অন্ধকার চুরি করা যায়?

৫ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
১৯ নভেম্বর, ২০০৭

ছিচল্লিশ

শাসকের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক নির্ণয়ে এবার আমরা হাডুডুর আয়োজন করলাম। আর শর্ত থাকলো এখানে শুধুমাত্র গত আর অনাগত নিহত ব্যক্তিরাই অংশগ্রহণ করবে। দেবতার ঘর আর শাসকের ঘর নিয়ে গতরাতে বিতর্কের অবসান হয়েছে, দু'ঘরেই অস্ত্রগুলো কেঁদেছে। অস্ত্রগুলো বস্ত্রহীন মানুষের লজ্জা বুঝেছিল, তাইতো শাসকের অস্ত্রাগারে অন্যরকম এক কান্নার জন্ম। সেদিন দেখলাম সূর্যকাকা ভারী হয়ে গেছে, এতটাই ভারী যে, যে কোনো মুহূর্তে ওজনস্তর লঙ্ঘন করে ফেলবে। তাইতো শাসকের ও দেবতার সাথে আমাদের বোঝাপড়া হওয়া উচিত। অন্ধকারে সর্বনাশের ঘোড়া তাড়িয়ে সম্রাট যেদিন মিশর পতন করে সেদিন সম্রাটের প্রেমিকা পেয়েছিল লাল গোলাপ। তাই দেখে সম্রাটের তরবারি কেঁদেছিল। আমরা এই মর্মে অশোকের কাছে গিয়েছি। সম্রাট অশোকের রক্তগঙ্গায় প্রিয় কোনো রক্ত ছিল না। অথচ অশোকের রক্তগঙ্গায় আমাদের পূর্বপুরুষের রক্ত দেবতার দিকে আঙুল তুলেছে। আমরা দেবতার দিকে ছুটে যাই, সেখানে দেখি পৃথিবীর সব শাসকের মুকুট নিয়ে খেলা চলিতেছে। তাইতো আমরা একটা হাডুডু খেলার আয়োজন করেছি, যেখানে শুধু আমরা খেলবো। একপক্ষে আমরা যারা মরে গেছি, অন্য পক্ষে আমরা যারা বেঁচে আছি।

৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
২০ নভেম্বর, ২০০৭

সাতচল্লিশ

আমরা হাঁটছি অথচ আমাদের পাগুলো বেঁকে যাচ্ছে হলুদের দিকে। যে কোনো হলুদ বড় বেশি সাপ বিশ্বাসী। ছোকরা চাঁদের বাড়িতে জোয়ান চাঁদেরা যায়, আমরা উল্টে পড়ে থাকি ঘড়ির ভেতর। এই যে আমরা এতকাল ঘড়ি ঘরে বাস করি তাতে কিন্তু আমাদের সময় অসময়ের জমা খরচ নেই। মৃত্যুর ঘানি টানতে টানতে আমাদের ফুরিয়ে আসে ছোকরা চাঁদের সময়। বেশি পুরনো নয়, আকালের বছর একবার চন্দ্রবৃষ্টি হলো, তোমাদের দেহের তালাচাবি উড়াল দিলো বলে আমাদের প্রয়োজন হলো। গোপনের ভেতর শৈশব আর তালাচাবি কীভাবে যেন গোপন হয়ে গ্যালো। মৃত্যুর উৎপাত বাড়লে নাকি এমনটা হয়। দু'দণ্ডের সুখের আশায় তোমার সাথে একদণ্ড দেখা হবে বলে সকল হতাশার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ালাম...তাইতো মহাকালের চাকায় সমস্ত জ্যোৎস্না গোল গোল হয়ে ঘোরে...

তবে কি একদিন সর্বনাশের সর্বনাশ হবে? শুরু হোক তোমার দেহ থেকে ফসকে যাওয়া রাতের গল্প। এই গল্পটা শোনার জন্য কি দারুণ ছুটে এসেছি আমি। ছুটে এসেছে ধূসর আকাশের বগা-বগী। জীবনের বগা-বগীরা কেন যে আটকা পড়ে যায় ফাঁদে? দেহ ফসকে যাওয়া রাতগুলো কেন যে বেড়ালের ঘরে বসে কাঁদে? আচ্ছা বলুন দেখি, ফাঁদের সাথে পায়ের সম্পর্ক এত মধুর কেন? চোখ ভরা হরিণ আর হরিণ ভরা আগুন নিয়ে শুরু হলো রাতের গল্প। এসব গল্পের হরফগুলো কাঙালের মুদ্রার মতো অসহায়। তাইতো গল্পের দলিল পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায়— এভাবে কি আর যুদ্ধ হয়? সব পরাজয় বাজে যুদ্ধের বাঁশিতে, মৃত্যুতো জুয়ার আসরে বড় হওয়া বালকের ডাক নাম। আর জুয়াই একমাত্র বিশ্বাসী পন্থা। তাইতো পৃথিবীর আকাশে উড়ছে অসংখ্য জুয়ার পাখি। সর্বনাশের সর্বনাশ হবে জেনেও কেন যে সর্বনাশ থেকে প্রাণের আকুতি পালায়? আমার ভেতর আমার মৃত্যু হবে জেনেও কেন যে তুমিও পালিয়েছ সর্বনাশের পথে...

এখনো গোলক ঘুরছে জেনে উন্মাদখানায় দিয়েছি দৌড়। গোলকের অন্তরে এত বাতাস দিলো কে? আগুনগুলো উদ্ভাবিত মাংসের দিকে দৌড় দিয়েছে। তাইতো পৃথিবীর রন্ধনশালায় মায়ার গন্ধ ছোটে... তবে কি অমরাবতী চুরির দিন পুড়েছিলে তুমি? উন্মাদখানায় পুড়ে যাচ্ছে সময়, পুড়ে যাচ্ছে ঘড়ি। আমাদের জীবনের দেয়ালে ঝুলে আছে ভুল ঘড়ি আর আমরা ভুল ঘড়ির আয়ুতে বেঁচে আছি। আমরা কাঁদছি অথচ আমাদের চোখগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে জুয়ার নেশায়...

১৩ কার্তিক, ১৪১৪
২৯ অক্টোবর, ২০০৭

আটচল্লিশ

সমস্ত আলো দাঁড়িয়ে গ্যালো তুলা গাছের বিরুদ্ধে। এই মাথা; যার ভেতর সহস্র বছরের করুণা। এই মাথাটা বিক্রি করে দেব বলে পিছু নিয়েছি এক মাথাওয়ালার। মাথাওয়ালার বামহাতে আছে শাসকের ঘড়ি, ডানহাতে অন্ধকারের চাতাল, ওই দু'হাতেই মাথাওয়ালা মানুষের মাথা কেনে পথে প্রান্তরে। যাক; আলো নিয়ে কথা বলে আর কী লাভ? এবার অন্ধকার; কথা হোক তুলা গাছের, আলো আর তুলাগাছ বিবাদের প্রথম সূত্র...
অসীম অসীম করে পশ্চিম পথে কিসের যেন মিছিল। আমার মিছিল ছোটে ওই মাথাওয়ালার দিকে। যুদ্ধবাজ মনের রক্ত মেখে মাথাওয়ালা পাড়া, মহাপাড়া দিয়ে মহাগ্রামের দিকে চলে যায়, আমি পিছু পিছু নাকফুলের গান গাই। মাথাওয়ালার পিছু নিয়েছি তো কি? একটু এদিক ওদিক করলেই তোমার দেখা মেলে। জানি তোমার দেখা মেললেও তোমার নাকফুলের দেখা মিলবে না। একবার মাথাওয়ালাদের ভেতর ফুলের প্রসঙ্গ উঠেছিল, কেউ বলে শিউলি, কেউ বলে কচুরিপানা, আমি বলেছিলাম নাকফুল। তখন পৃথিবীর সমস্ত

নাকফুল কেঁদে উঠেছিল। এবার নাকফুল আর মাথাওয়ালা বিবাদের দ্বিতীয় সূত্র...
এখানে দেখছি দাঁতভাঙা হচ্ছে, বেশি দাঁতের মাথাগুলো শামুকের মতো ভেঙে ফেলছে মাথাওয়ালারা। আমি ভয়ে ভয়ে আমার দাঁতগুলো গুনি। মনে পড়ে যায় শৈশবের এক সাপওয়ালার কথা। ওই সাপওয়ালা দুই হাতে দুই সাপ ধরে বলেছিলো— 'তোমারও দু'খানা সাপ আছে বাবা।' আমি তখন আমার দু'হাত নেড়ে চেড়ে দেখি সেখানে কোনো বিষ আছে কিনা? মাথাওয়ালারা শীতের পূর্বহাওয়ায় ঘোরে। শীত এলেই এরা পথে পথে মানুষের মাথা কেনে। আর ওদের মাথারাখা টিনের বাক্সে চুন দিয়ে লেখা থাকে 'আমি আর মহাকাল আমরা দুই ভাই...'

১৩ কার্তিক, ১৪১৪
২৯ অক্টোবর, ২০০৭

উনপঞ্চাশ

কালান্তরে ফুল ফুটেছে, কিন্তু সে গন্ধ কি আর আমরা পাবো? এখানে মরা মানুষের ফুল ফুটেছে তারই গন্ধে মাটিগুলো দুমড়ে মুচড়ে যায়। কার্তিক মাস তো এমন ছিল না? কার্তিক মাসে আমাদের জীবনানন্দ কত কথাই না বলতো, তখন কালান্তরে উঠেছিল চাঁদ। চাঁদ মরে গিয়েছিল বলে রূপসী বাংলায় কত কান্না ছিল। আর এখন? সবইতো মরা, সব চোখ দিয়ে তো দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। কালান্তরে ফুল ফুটেছে এ দিয়ে আমাদের কি আসে যায়, আমরা হাজার হাজার মরেছি, হাজার হাজার খুঁজে পাই না, আমরা যখন তখন হাজার হাজার হয়ে উঠি। কার্তিকের হাওয়ায় জ্যোৎস্না ওড়ে, এ কথা শুনে শুনে আমরা বড় হয়েছি, বড় হয়ে যাওয়া কিশোরীর প্রথম ঋতুর মতো বড় হয়েছি। কিন্তু কার্তিকের হাওয়া যে মৃত্যুর হাওয়া কে জানতো। এই জন্য কোনো ভালো গল্প আর আমাদের ভালো লাগে না। আমরা মৃত্যুমুখর নগরের, মৃত্যুমুখর গ্রামের। এই যে ধরুন? আমার বাবা, আমার মা, আমার বোন। এই যে ধরুন? কুকুরের বাবা, কুকুরের মা, কুকুরের প্রেমিকা সবই মরেছে; কুকুরের ইতিহাস এবার কার্তিককেই লিখতে হবে। বছর ঘুরে ঘুরে আমরা মরা হয়ে উঠি তবুও কালান্তরে ফুল ফোটে; কিন্তু জেনে রাখবেন সে ফুলের গন্ধ আমাদের কাছে আসে না, আমাদের কাছে আসে পুরনো, নতুন মৃত্যুর গন্ধ।

৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
২০ নভেম্বর, ২০০৭

পঞ্চাশ

যাবার সময় হলো, অথচ সময়ের যাওয়া হলো না। এই জনপদ থেকে সময় আর যাবে না। যাবে না বলে রাত দিনের আর এক হওয়া হলো না। সবাই হলো বিমুখ, কেউ কেউ চলে গ্যালো কিশোরী পথ দিয়ে, কেউ কেউ জোয়ান পথের আশায় তীর্থের দিকে... বিধবা পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছ তুমি, আমিও বেঁধে ফেলেছি এসব পথের এমাথা ওমাথা। যাবার সময় কেন যে খুঁজে পাই না তেমাথা পথের চাবি? অবশ্য চাবির তো আর খুব বেশি প্রয়োজন নেই, সব প্রান্তর খোলা হয়েছে। খোলা প্রান্তর দিয়ে যেতে খুব কষ্ট লাগে, তুমিও যেতে পারবে তো? ভাঙা জীবনের কাচগুলো বড় বেশি ক্ষিপ্র, পেরে যাবে নিশ্চয়! পায়ে আছে সময়ের অভিশাপ। আমিও পেরে যাবো আলোকবর্ষের মতো। এক আলোকবর্ষ হতে আরেক আলোকবর্ষ সব কিছু ভারী ভারী লাগছে।

যাবার সময় তোমার মুখ চোখ আর খুঁজে পাই না। খুঁজে পাচ্ছি না হারিয়ে যাওয়া নবীন আঁধার। তোমরাইতো বলতে যাবার কালে খুঁজে পাবে তারে। কই, সামনে পেছনে কোনো আলো নেই তো? সব আলো যেন বাতাবিলেবুর কাছে। সব আলো আছে নতুন সাপের খালে। সময়ের রাজ্যে— নমরুদের ঘোড়া ঘরে ফেরার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে, তাইতো নিলাজ কুলটা কুয়াশানদী বার বার তাড়া দেয়। তাইতো ধামের বালিকারা আড়ি পাতে, গাঁয়ের লোকটা পাগল বটে বলে না কিছুই। আমার কিন্তু সিথায়েরন পাহাড় নেই, আমি কিন্তু অন্ধও হইনি, আমি কিন্তু দশ মাথার পিতাও নই; তবুও আমাকে চলে যেতে হবে আলোকবর্ষের দিকে, আমার পেছনে কোনো অভিশাপও নেই, শুধু এই জনপদ থেকে সময় গ্যালো না বলে তুমি আজীবন থাকলে রাত। তাইতো পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই তোমার পাশাপাশি

আছি, তবু মেলেনি দেখা। তাইতো তোমার বিস্ময়ের কাছাকাছি আমার ঘোড়াগুলো নিস্তেজ হয়ে আসে, দেখেছো তুমি আমার ঘোড়ার কান্না? এ বিচার কেহ মানে? তোমার মৃত্যুর দিনে আমি অবৈধ? তোমার মৃত্যুদিনে আমি রক্তের দিকে যাবো...

৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
২০ নভেম্বর, ২০০৭